মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৪, সংখ্যা-০২
মার্চ ২০১৫ ইং, জুমাদাল উলা ১৪৩৬ হি., ফাল্গুন ১৪২১ বাং

الأبرار
مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية
جمادى الاولى ١٤٣٦ مارس ٢٠١٥م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :............................. ৪
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৩ ..... ৭
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১২
মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত :
আত্মশুদ্ধির পথে করণীয়.............................. ১৩
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
শরীয়তের দৃষ্টিতে আকীকা, খতনা ও কাফন-দাফন ১৬
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
নবীজির (সা.) উত্তম চরিত্রই হোক
আমাদের জীবনপাথেয়.................................. ১৯
মুফতী জামীল আহমদ সাহেব
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৪........ ২১
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
কোরআন-সুন্নাহর আলোকে
উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব...................... ২৭
মাওলানা কাসেম শরিফ
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১১...... ৩২
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১০....... ৩৮
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪২
মলফূজাতে আকাবের ৪৭
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

জাগরূক হোক প্রকৃত মানবতাবোধ

মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন থেকে আরম্ভ করে সামষ্টিক জীবন তথা সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা ও সংকট দেখা দিতে পারে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হতেই পারে। তবে সব কিছুর একটা ত্বরিত সমাধান থাকতে হবে, শেষ অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু বর্তমান মুসলিম বিশ্বে নতুন নতুন যেসব সংকট সৃষ্টি হচ্ছে, তা যেন সুদূরপ্রসারী, অতি দীর্ঘ। যার সমাধান অনেক ক্ষেত্রে নিকট ভবিষ্যতে কল্পনাও করা যাচ্ছে না। এটি কিন্তু মুসলমানদের নতুন করে ভাবার বিষয়। নিকট অতীতেই মুসলিম দুনিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্র অকল্পনীয় বিপদসঙ্কুল অবস্থায় নিপতিত। এহেন ভয়াবহ নাজুক পরিস্থিতি থেকে কখন, কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারবে, আপাত দৃষ্টিতে তা বোঝা মুশকিল। এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারছেন না অভিজ্ঞমহলও।

সম্প্রতি ভয়াবহ সংকটময় মুহূর্ত পার করছে অতি শান্তির দেশ বাংলাদেশও। এই সংকটকে যে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গণমানুষ ও রাষ্ট্র, এতে কোনো সন্দেহ নেই। দেশের জনগণ ও রাষ্ট্র অনেক খেসারত দেওয়ার পর এই সংকট থেকে হয়তো একসময় বেরিয়ে আসবে। জনগণ এবং রাষ্ট্রের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে, এরও হয়তো দায় কেউ নেবে না, নিতে চাইবে না।

দেখার বিষয় হলো, সংকট কেন সৃষ্টি হবে? সুদূরপ্রসারীই বা কেন হবে? সংকটের এই ঘনঘটা ঘুরেফিরে শুধু মুসলিম দুনিয়াকেই বা কেন আচ্ছন্ন করে–এসব প্রশ্ন থেকেই যায়।

ইসলাম যে আদর্শের শিক্ষা দেয়, যে চিন্তাধারার অনুশীলন করতে বলে তাতে তো সংকট সৃষ্টি হওয়ার কোনো পথই বাকি রাখা হয়নি। বরং দুনিয়াব্যাপী সৃষ্ট সংকট নিরসনই ছিল ইসলাম আগমণের একটি কারণ। ইসলামের কথা হলো, জনগণ এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেক বিভাগকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সংকটই সৃষ্টি না হয়। এতদসত্ত্বেও যে সংকট সৃষ্টি হয় তার কারণ নির্ণয়ে ইসলামের শাশ্বত ব্যাখ্যা হলো,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

মানুষ নিজ হাতে যা করে, তার ফলে স্থলে ও জলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন সে জন্য; হয়তো (এর ফলে) তারা ফিরে আসবে। (সূরা রূম ৪১)

পবিত্র কোরআনের এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, পার্থিব জীবনে মানবসমাজে সৃষ্ট অশান্তি, দুর্যোগ, সংকট, সমস্যা এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ–সবই মানুষের কর্মফল। সে কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে মানুষের কর্মময় জীবনে এমন চরিত্র ও চিন্তাচেতনার শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে মানুষ নিজের কর্মের কারণে বিপদগামী না হয়। তাদের জীবনের কোনো অংশ সংকটাপন্ন হয়ে না পড়ে।

ইসলাম মানুষের জানমালের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও স্থান দিয়ে থাকে। এ জন্য ইসলাম মানব জাতিকে প্রকৃত মানবতাবোধ শিক্ষাদানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচের মধ্যেই গড়ে তুলতে চায়। মুসলমানগণ নিজের মধ্যে কী কী গুণাবলির সমাবেশ ঘটাবে, পরস্পরের সাথে কিরূপ আচরণ করবে, ক্ষমতাসীনদের আচরণ কী হবে, জনগণের সাথে রাষ্ট্রের কী আচরণ হবে, জনগণ রাষ্ট্রের প্রতি কী আচরণ করবে–প্রতিটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েই ইসলাম নির্দিষ্ট চৌহদ্দিটি তৈরি করেছে।

এমন কিছু বিষয়ও এতে রয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের কাছেই থাকা আবশ্যক। প্রকৃত ইসলামের ওপর থাকতে হলে প্রত্যেক মুসলমানকে উক্ত গুণাবলি অর্জন ও চর্চার বিকল্প নেই। সমাজ বা রাষ্ট্রে নিরাপদ ও উত্তমভাবে চলতে হলে শাসক-শাসিত সকলের মধ্যে ওই সব গুণাবলির সমাবেশ ঘটাতে হবে। এ ধরনের বিষয়গুলো যদি প্রত্যেক মানুষ অর্জন করতে পারে, দুনিয়ায় অশান্তি ও সংকটের লেশমাত্র থাকার কথা নয়।

সেরূপ কিছু বিষয় যেমন–

সত্যবাদিতা

পবিত্র কোরআনে এসেছে,

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হও।" (সূরা তাওবাহ : ১১৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

"তোমরা সততা গ্রহণ করো, কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়, একজন লোক সর্বদা সত্য বলতে থাকে এবং সত্যবাদিতার প্রতি অনুরাগী হয়, ফলে আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।" (মুসলিম)

আমানতদারি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট আদায় করে দিতে।" (সূরা নিসা : ৫৮)

অঙ্গীকার পূর্ণ করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

"আর অঙ্গীকার পূর্ণ করো, কেননা অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা ইসরা : ৩৪)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করেছেন।

বিনয়

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

"তুমি তোমার পার্শ্বদেশ মুমিনদের জন্য অবনত করে দাও।" (সূরা হিজর : ৮৮)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

"আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট ওহী নাযিল করেছেন যে, 'তোমরা বিনয়ী হও, যাতে একজন অপরজনের ওপর অহংকার না করে। একজন অপরজনের ওপর সীমালঙ্ঘন না করে।" (মুসলিম)

সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

"আর মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো, নিকটাত্মীয়, এতিম-মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর প্রতিও।" [সূরা নিসা : ৩৬]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'জিবরাঈল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে ওসিয়ত করছিলেন, এমনকি আমি ধারণা করে নিলাম যে, প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার বানিয়া দেওয়া হবে হয়তো।' [বুখারী ও মুসলিম]

আতিথেয়তা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।" [বুখারী ও মুসলিম]

সাধারণভাবে দান ও বদান্যতা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর যা খরচ করেছে তা থেকে কারো প্রতি অনুগ্রহ ও কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য করে না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তায়ও পড়বে না।" [সূরা বাকারাহ : ২৬২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'যার নিকট অতিরিক্ত বাহন থাকে সে যেন যার বাহন নেই, তাকে তা ব্যবহার করতে দেয়। যার নিকট অতিরিক্ত পাথেয় বা রসদ রয়েছে, সে যেন যার রসদ নেই, তাকে তা দিয়ে সাহায্য করে।" [মুসলিম]

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও উদারতা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

"আর যে ধৈর্যধারণ করল এবং ক্ষমা করল, নিশ্চয়ই এটা কাজের দৃঢ়তার অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা শুরা : ৪৩]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'তারা যেন ক্ষমা করে দেয় এবং উদারতা দেখায়, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া কি তোমরা পছন্দ করো না?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "দান-খয়রাতে সম্পদ কমে না। আল্লাহ পাক ক্ষমার দ্বারা বান্দার মার্যাদাই বৃদ্ধি করে দেন। যে আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন।" [মুসলিম] তিনি আরো বলেন, "দয়া করো, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। ক্ষমা করে দাও, তোমাদেরও ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" [আহমাদ]

সমঝোতা ও সংশোধন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

"তাদের অধিকাংশ শলাপরামর্শের মধ্যে কল্যাণ নেই। কেবলমাত্র সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে সাদকাহ, সৎকর্ম ও মানুষের মাঝে সংশোধনের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এসব করে অচিরেই আমরা তাকে মহা প্রতিদান প্রদান করব।" [সূরা নিসা : ১১৪]

লজ্জা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'লজ্জা ঈমানের বিশেষ অংশ।' [বুখারী ও মুসলিম]

আরেকটি হাদীসে এসেছে, "লজ্জা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।" [বুখারী ও মুসলিম]

দয়া ও করুণা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, "মুমিনদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, করুণা ও অনুকম্পার উপমা হচ্ছে একটি শরীরের মতো। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় গোটা শরীর নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" [মুসলিম]

ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ইহসান ও নিকটাত্মীয়দের দান করতে নির্দেশ দেন।" [সূরা নাহাল : ৯০]

আরেক আয়াতে আছে,

"ইনসাফ করো, এটা তাকওয়ার অতীব নিকটবর্তী।" [সূরা মায়েদা : ৮]

চারিত্রিক পবিত্রতা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, "তোমরা আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জিম্মাদার হও। তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। যখন তোমাদের কেউ কথা বলে সে যেন মিথ্যা না বলে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন যেন খিয়ানত না করে। যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তা যেন ভঙ্গ না করে। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি অবনত করো। তোমাদের হস্তদ্বয় সংযত করো। তোমাদের লজ্জা স্থান হেজাফত করো।" [তাবারানী]

এরূপ আরো অনেক গুণাবলি, যা শুধু মুসলমান নয় বরং ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য এবং মানবতার বিকাশে আবশ্যক। এর বাইরেও ইসলাম যাবতীয় অসৎ গুণাবলি। যেমন–লোভ-লালসা, অহমিকা-পরচর্চা, ঈর্ষা ইত্যাদির নিন্দা জানিয়েছে এবং কঠোর শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীও করেছে। বিভিন্ন অপকর্ম তথা জুলুম-অত্যাচার, গুম-হত্যা, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদির কঠোর থেকে কঠোর শাস্তির বিধানও রেখেছে। সব কিছুর পর ইসলামের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো, 'মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্যেরা নিরাপদ।'

বোঝা যায়, মানব জীবনে সংকট-সমস্যা সৃষ্টি ও ঘনীভূত হওয়ার কোনো ছিদ্রই বাকি রাখেনি ইসলাম। এর পরও বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ভয়াবহ সংকটে দিন পার করতে হচ্ছে স্বয়ং মুসলমানদেরকে। তাজা রক্ত ঝরছে মুসলমানদের, লাশের মিছিল বড় হচ্ছে মুসলমানদেরই। এমনকি বাংলাদেশের মতো দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্রেও।

এখনো কি আমরা চিহ্নিত করতে পারব না, আমাদের মূল ত্রুটি ও গলদটি কোন জায়গায়? সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সময় থাকতেই ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে আমাদেরকে যাবতীয় সংকট সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। মানবিক উত্তম গুণাবলির প্রতিফলন আমাদের সার্বিক জীবনে ঘটাতে হবে। জাগ্রত করতে হবে আমাদের মাঝে প্রকৃত মানবতাবোধ।

আরশাদ রহমানী

ঢাকা।

২৪/০২/২০১৫ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١٥) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٦) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

(১৪) মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদিপশুকুল এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (১৫) বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চেয়েও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলব? যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রস্রবন প্রবাহিত–তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। (১৬) যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো। (১৭) তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

দুনিয়ার মহব্বত

হাদীস শরীফে এসেছে–

حب الدنيا رأس كل خطيئة

"দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের মূল।" এখানে প্রথম আয়াতে দুনিয়ার কয়েকটি প্রধান কাম্য বস্তুর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে–মানুষের দৃষ্টিতে এসবের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে। তাই অনেক মানুষ এদের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরকালকে ভুলে যায়। আয়াতে যেসব বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনার লক্ষ্যস্থল। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম রমণী ও পরে সন্তান-সন্ততির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছুই অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, সবগুলোর মূল কারণ থাকে নারী অথবা সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে স্বর্ণ, রৌপ্য, পালিত পশু ও শস্যক্ষেতের কথা। কারণ এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের কাঙ্ক্ষিত ও প্রিয় বস্তু।

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। একটি এই যে, এসব বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ বা মোহ না থাকলে জগতের সমুদয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠত না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্যক্ষেতে কাজ করতে অথবা মজুরি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিশ্রম করতে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ ও কায়িক শ্রম ব্যয় করতে কেউ প্রস্তুত হতো না। মানব-স্বভাবে এসব বস্তুর প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি করার মধ্যেই জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এসব বস্তুর উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর শ্রমিক কিছু পয়সা উপার্জনের চিন্তায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধনী ব্যক্তি কিছু পয়সা খরচ করে শ্রমিক জোগাড় করার চিন্তায় বের হয়। ব্যবসায়ী উৎকৃষ্টতর পণ্যদ্রব্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে গ্রাহকের অপেক্ষায় বসে থাকে–যাতে কিছু পয়সা উপার্জন করা যায়। এদিকে গ্রাহক অনেক কষ্টার্জিত পয়সা নিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বাজারে পৌঁছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এসব প্রিয় বস্তুর ভালোবাসাই সবাইকে আপন আপন গৃহ থেকে বের করে আনে এবং এ ভালোবাসাই দুনিয়াজোড়ে সভ্যতা-সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যবস্থাকে মজবুত ও দৃঢ় একটা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় রহস্য এই যে, জাগতিক নিয়ামতের প্রতি মানুষের মনে আকর্ষণ ও ভালোবাসা না থাকলে পারলৌকিক নিয়ামতের স্বাদ জানা যেত না এবং তৎপ্রতি আকর্ষণ হতো না। এমতাবস্থায় সৎকর্ম করে জান্নাত অর্জন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত হয়ে দোযখ থেকে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করত না।

এখানে অধিকতর প্রণিধানযোগ্য হলো তৃতীয় রহস্যটি, অর্থাৎ এসব বস্তুর ভালোবাসা স্বভাবগতভাবে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যে, কে এগুলোর আকর্ষণে মশগুল হয়ে পরকালকে ভুলে যায় এবং কে এসবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও পরকালীন কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু ব্যবহার করে। কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতে এর রহস্যটিই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছ–

انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا۔

অর্থাৎ আমি পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে পৃথিবীর সৌন্দর্যরূপে সৃষ্টি করেছি–যাতে মানুষের পরীক্ষা নিতে পারি যে, কে তাদের

মধ্যে উত্তম কর্ম সম্পাদন করে

এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, জগতের মোহনীয় বস্তুগুলোকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেওয়াও আল্লাহ তা'আলারই কাজ। এর রহস্য অনেক। কিন্তু কোনো কোনো আয়াতে সুশোভিত করে দেওয়া শয়তানের কাজ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত زين لهم الشيطان اعمالهم অর্থাৎ শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দিয়েছে। এসব আয়াতের অর্থ এমন বস্তুকে সুশোভিত করা, যা শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে মন্দ অথবা সীমাতিরিক্ত লোভনীয় করার কারণে মন্দ। নতুবা শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে সুশোভিত করা মন্দ নয়, বরং এতে অনেক উপকারও নিহিত আছে। এ কারণেই কোনো কোনো আয়াতে এই সুশোভিত করাকে পরিষ্কারভাবে আল্লাহর কাজ বলা হয়েছে।

মোট কথা এই যে, জগতের সুস্বাদু ও মোহনীয় বস্তুগুলোকে আল্লাহ তা'আলা কৃপাবশত মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তৎপ্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর অনেকগুলো রহসস্যের মধ্যে অন্যতম রহস্য, মানুষের পরীক্ষা নেওয়া। বাহ্যিক কাম্যবস্তু ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বাদে মশগুল হওয়ার পর মানুষ কিরূপ কাজ করে আল্লাহ তা'আলা তা দেখতে চান। এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহকে স্মরণ করে এবং এগুলোকে তাঁর মা'রেফাত ও মহব্বত লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে, তবে বলা যায় যে, সে দুনিয়াতেও উপকৃত হয়েছে এবং পরকালেও সফলকাম হবে। জগতের লোভনীয় বস্তু তার পথের কাঁটা হওয়ার পরিবর্তে তার পথপ্রদর্শক ও সহায়ক হয়েছে। পক্ষান্তরে এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ এগুলোর মধ্যেই আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে স্রষ্টাকে, পরকালে তাঁর সম্মুখে উপস্থিতিকে এবং হিসাব-নিকাশকে ভুলে যায়, তবে বলতে হবে, এসব বস্তুই তার পারলৌকিক জীবনের ধ্বংস ও অনন্তকাল শাস্তিভোগের কারণ হয়েছে। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জগতেরও এসব বস্তু তার শাস্তির কারণ ছিল। এ ধরনের মানুষ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে–

فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها فى الحيوة الدنيا

অর্থাৎ আপনি কাফিরদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হবেন না। কারণ অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়াতে এসব অবাধ্যদের কোনো উপকার হয়নি। বরং এসব অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আখেরাতে তো তাদের শাস্তির কারণ হবেই, দুনিয়াতেও দিবা-রাত্রির চিন্তা ও ব্যস্ততার কারণে এগুলো এক ধরনের শাস্তি বৈ আর কিছু নয়।

মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু সঞ্চয় করলে ইহকাল ও পরকালের কামিয়াবী হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা বৈধ পন্থায় হলেও সেগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে পরকাল বিস্মৃত হয়ে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। মাওলানা রূমী এ বিষয়টির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন–

آب اندر زیر کشتی پشتی است ☆ آب در کشتی هلاک کشتی است

অর্থাৎ, "দুনিয়ার সাজসরঞ্জাম পানির মতো এবং এতে মানুষের অন্তর একটি নৌকার মতো। পানি যতক্ষণ নৌকার নিচে ও আশপাশে থাকে, ততক্ষণ তা নৌকার জন্য উপকারী ও সহায়ক। পক্ষান্তরে পানি যদি নৌকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তবে তাই নৌকাডুটি ও ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।"

এমনিভাবে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ যতক্ষণ মানুষের অন্তরে প্রাধান্য বিস্তার না করে, ততক্ষণ তা মানুষের ইহকাল ও পরকালের জন্য উপকারী ও সহায়ক। পক্ষান্তরে অর্থ-সম্পদ যদি মানুষের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবেই তার অন্তরের মৃত্যু ঘটে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি বিশেষ লোভনীয় বস্তুর কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে–

ذلك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسن المأب

অর্থাৎ, এসব বস্তু হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্য। মন বসাবার জন্য নয়। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। অর্থাৎ যেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নিয়ামত ধ্বংস হবে না, হ্রাসও হবে না।

পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কিত আরো ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–

قل اؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنت تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔

এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যারা দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নিয়ামতে মত্ত হয়ে পড়েছে, আপনি তাদের বলে দিন যে, আমি তোমাদের আরো উৎকৃষ্টতর নিয়ামতের সন্ধান বলে দিচ্ছি। যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা আল্লাহর অনুগত, তারাই এ নিয়ামত পাবে। সে নিয়ামত হচ্ছে সবুজ বৃক্ষলতাপূর্ণ বেহেশত, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তাতে থাকবে সকল প্রকার আবিলতামুক্ত পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি।

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ রমণীকুল, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্য ভাণ্ডার, উৎকৃষ্ট অশ্ব, পালিত জন্তু ও শস্যক্ষেত। এদের বিপরীতে পরকালের নিয়ামতরাজির মধ্যে বাহ্যত তিনটি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম, জান্নাতের সবুজ বাগবাগিচা। দ্বিতীয়, সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে দুই কারণে মানুষ সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসে। প্রথমত, সন্তান-সন্ততি পিতার কাজকর্মে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততি দ্বারা পিতার নামটুকু থেকে যায়। কিন্তু পরকালে কারও

সাহায্যের প্রয়োজন নেই এবং মৃত্যুও নেই যে, কোনো অভিভাবক অথবা উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন হবে। এ ছাড়া দুনিয়াতে যার সন্তান-সন্ততি আছে, সে জান্নাতে তাদেরকে পাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় যার সন্তান নেই, প্রথমত জান্নাতে তার মনে সন্তানের বাসনাই হবে না। আর কারও মনে বাসনা জাগ্রত হলে আল্লাহ তাকে তাও দান করবেন। তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, কোনো জান্নাতীর মনে সন্তানের বাসনা জাগ্রত হলে সন্তানের গর্ভাবস্থা, জন্মগ্রহণ ও বয়োপ্রাপ্তি মুহূর্তের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তার মনের বাসনা পূর্ণ করা হবে।

এমনিভাবে জান্নাতে স্বর্ণ-রৌপ্যের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এই যে, দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে আসবাবপত্র ক্রয় করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সব কিছু এর মাধ্যমেই জোগাড় করা যায়। কিন্তু পরকালে ক্রয়-বিক্রয়েরও প্রয়োজন হবে না এবং কোনো কিছুর বিনিময়ও দিতে হবে না। বরং জান্নাতীর মন যখন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা সরবরাহ করা হবে। এ ছাড়া জান্নাতে সোনা-রুপার কোনো অভাব নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে কোনো কোনো প্রাসাদের এক ইট সোনার ও এক ইট রুপার হবে। মোট কথা, পরকালের হিসাবে সোনা-রুপাকে কোনো উল্লখযোগ্য বস্তুই মনে করা হয়নি।

এমনিভাবে দুনিয়াতে ঘোড়ার কাজ হলো, বাহন হয়ে পথের দূরত্ব অতিক্রম করা। জান্নাতে সফর ও যানবাহন প্রভৃতি কোনো কিছুরই প্রয়োজন হবে না। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, শুক্রবার দিন জান্নাতীদের আরোহনের জন্য উৎকৃষ্ট ঘোড়া সরবরাহ করা হবে। এগুলোতে সওয়ার হয়ে জান্নাতীরা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা করতে যাবে।

মোট কথা, জান্নাতে ঘোড়ারও কোনো উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব নেই। এমনিভাবে পালিত পশু কৃষিক্ষেত্রে কাজে আসে অথবা তা দুগ্ধ দান করে। জান্নাতে দুগ্ধ ইত্যাদি পশুর মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা দান করবেন।

কৃষিকাজের অবস্থাও তদ্রূপ। দুনিয়াতে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শস্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করা হয়। জান্নাতে সকল প্রকার শস্য আপনাআপনি সরবরাহ হবে। কাজেই সেখানে কৃষিকাজের প্রয়োজনই নেই। তবুও যদি কেউ কৃষিকাজকে ভালোবাসে, তবে তার জন্য সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। তাবারানীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে এক ব্যক্তি কৃষিকাজের বাসনা প্রকাশ করবে। তাকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। অতঃপর শস্যের বপন, রোপণ, পাকা ও কর্তন কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এসব কারণেই জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে শুধু জান্নাত ও জান্নাতের হুরদের বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, জান্নাতীদের জন্য কোরআনে এ ওয়াদাও রয়েছে যে, لهم ما يشتهون অর্থাৎ তারা যে বাসনাই প্রকাশ করবে, তাই পাবে।" এহেন ব্যাপক ঘোষণার পর বিশেষ কোনো নিয়ামতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে কি? তা সত্ত্বেও কয়েকটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো প্রত্যেক জান্নাতী চাওয়া ছাড়াই পাবে। অর্থাৎ জান্নাতের সবুজ বাগবাগিচা, অপরূপ সুন্দরী রমণীকুল। এগুলোর পর আরো একটি সর্ববৃহৎ নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে মানুষ এর কল্পনাও করে না। তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অশেষ সন্তুষ্টি। এরপর অসন্তুষ্টির কোনো আশঙ্কা থাকবে না। হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে পৌঁছে আনন্দিত ও নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং তাদের কোনো আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাদের সম্বোধন করে বলবে, এখন তোমরা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছ। আর কোনো বস্তুর প্রয়োজন নেই তো? জান্নাতীগণ আরয করবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি এত নিয়ামত দান করেছেন যে, এরপর আর কোনো নিয়ামতের প্রয়োজনই থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এখন আমি তোমাদের সব নিয়ামত থেকে উৎকৃষ্ট একটি নিয়ামত দিচ্ছি। তা এই যে, তোমরা সবাই আমার অশেষ সন্তুষ্টি লাভ করেছ। এখন অসন্তুষ্টির আর কোনো আশঙ্কা নেই। কাজেই জান্নাতের নিয়ামতরাজি ছিনিয়ে নেওয়ার অথবা হ্রাস করে দেওয়ারও কোনো আশঙ্কা নেই।

এ দুটি আয়াতের সারমর্মই রাসূল (সা.) বলেছেন–

الدنيا ملعونة وملعونة مافيها الا ما ابتغى به وجه الله وفى رواية الا ذكر الله وما والاه او عالما او متعلما۔

দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তাও অভিশপ্ত। তবে ওই সব বস্তু নয়, যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়। এক রিওয়ায়াতে আছে–তবে আল্লাহর যিকির এবং আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তু অথবা আলিম কিংবা তালেবে ইলম এ অভিশাপের আওতামুক্ত।

সুতরাং আমাদের সকলকে দুনিয়াবী বিষয়ে অত্যন্ত ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। দুনিয়ার জন্য অন্যের প্রতি জুলুম হচ্ছে কি না? দুনিয়ার কিছু অর্জনের জন্য সীমা লঙ্ঘন করছি কি না? পার্থিব বিষয়ের জন্য নিজের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছি কি না? দুনিয়ার সকল মুসলমানের এসব চিন্তা করেই যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

(অবলম্বনে-তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআন ও তাফসীরে ইবনে কাসীর)

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৩

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। অথচ বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নাম্বার হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

হাদীস নং ৪ :

عن ابى سعيد الخدرىؓ ان رسول الله ﷺ قال ليذكرن الله اقوام فى الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الله فى الدرجات العلى

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, অনেক মানুষ দুনিয়াতে নরম নরম বিছানার ওপর বসে আল্লাহ তা'আলার যিকির করে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়ে দেন। (সহীহে ইবনে হিব্বান (আল ইহসান) ২/১২৪ হা. ৩৯৮, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৮ হা. ১৬৭৭৭, মুসনাদে আবু ইয়ালা ২/৩৮ হা. ১১০৫, জামেউ সগীর ৪/১৫২৪ হা. ৭৫৬০)

হাদীসটির ইবারত মাজমাউয যাওয়ায়েদের।

হাদীসটি সহীহ। (ইমাম সুয়ূতী (রহ.), জামেউস সগীর ৪/১৫২৪)

قال رسول الله ﷺ سبق المفردون قالوا وما المفردون يارسول الله قال: الذاكرون الله كثيرا۔۔۔

(মুসলিম শরীফ ২/৩৪১ হা. ২৬৭৬, তিরমিযী ২/২০০ হা. ৩৫৯৫)

হাদীসটি সহীহ।

قال المستهزرون فى ذكر الله يضع الذكر عنهم اثقالهم فياتون يوم القيامة خفافا۔

(তিরমিযী ২/২০০ হা. ৩৫৯৬ [আবু হুরায়রা রা.], মুসতাদরাকে হাকেম ১/৬৭৩ হা. ১৮২৩, জামেউস সগীর ৭/৩৫১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৫ হা. ১৬৭৫৪ [আবু দারদা রা.])

হাদীসটি সহীহ (জামেউস সগীর ৭/৩৫১৪, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৬৭৩)

ক. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যদি তোমরা সব সময় যিকিরের মধ্যে মশগুল থাকো তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানার ওপর ও পথের মধ্যে তোমাদের সাথে মোসাফাহা করতে শুরু করবে।

হাদীসটির আরবী ইবারত :

عن حنظلة الاسيدى قال: قال رسول الله ﷺ والذى نفسى بيده ان لوتدومون على ماتكون عندى، وفى الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم ولكن ياحنظلة ! ساعة وساعة ثلاث مرات۔

(মুসলিম ২/৩৫৫ হা. ২৭৫০, তিরমিযী শরীফ ২/৭৭ হা. ২৫১৪, ইবনে মাজাহ ৩১২ হা. ৪২৩৯)

হাদীসটি সহীহ।

খ. হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, তুমি তোমার সুখের সময়গুলোতে আল্লাহ তা'আলা যিকির করো, তোমার দুঃখের সময়গুলোতে কাজে আসবে।

عن ابى الدرداءؓ موقوفا قال : اذكر الله عند كل حجيرة وشجيرة ومدرة واذكره فى سرائك تذكره فى ضرائك۔

(শু'আবুল ঈমান ২/৫২ হা. ১১৪১, তাফসীরে দুররে মনসুর ১/৩৬৬, কিতাবুয যুহদ [ইমাম আহমদ রহ.] ২/৫৩, মুসনাদে শামিয়ীন [তাবরানী] ১/৩৮৮, কানযুল উম্মাল ৬/৭৩৩ হা. ১৭৬১৮)

হাদীসটি সহীহ। এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

গ. হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন, বান্দা যখন তার সুখ, আনন্দ ও প্রাচুর্যের সময় আল্লাহ তা'আলার যিকির করে, অতঃপর সে কোনো মুসীবতে পড়ে, তখন ফেরেশতারা বলেন, এটি কোনো দুর্বল বান্দার পরিচিত আওয়াজ। অতঃপর আল্লাহর দরবারে তার জন্য সুপারিশ করে। আর যে ব্যক্তি সুখের সময় আল্লাহর যিকির করে না অতঃপর কোনো কষ্ট ও মুসীবতে পড়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন ফেরেশতারা বলে, এটি কোনো অপরিচিত আওয়াজ।

عن سلمانؓ موقوفا: اذا كان العبد يذكر الله فى السراء ويحمده فى الرخاء فاصابه ضر، فدعا الله قالت الملائكة صوت معروف من امرئ ضعيف، فيشفعون له، وان كان العبد لايذكر الله فى السراء ولا يحمده فى الرخاء فاصاب ضر فدعا الله قالت الملائكة : صوت منكر فلم يشفعوا له۔

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৩/৩৩৩ হা.৩৫৮০৯, ১০/৩০৮ হা.২৯৪৮০)

হাদীসটি সহীহ। এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (দেখুন, শায়খ আওয়ামা কর্তৃক ইবনে আবী শায়বার টিকা)

ঘ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জান্নাতের আটটি দরজা আছে, তন্মধ্যে একটি দরজা শুধু যিকিরকারীদের জন্য রয়েছে।

عن ابن عباسؓ للجنة ثمانية ابواب باب للمصلين۔۔۔ وباب للذاكرين۔۔

(দুররে মনসূর ৭/২৬৪, তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ১০/২৬২, হা. ১৮৪১৪)

অন্য হাদীসের সমর্থনের কারণে **হাদীসটির মর্মার্থ সহীহ।** (আসসুন্নাহ লি আবী আসেম, হা. ১২৩৭)

ঙ. এক হাদীসে আছে যে ব্যক্তি বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করে সে মোনাফিকী হতে মুক্ত।

من اكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق

(মু'জামুল আওসাত ৭/১২৪, হা. ৬৯৩১, মু'জামুস সগীর ২/৭৬, হা. ৯৪৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/৭৯ হা. ১৬৭৮৫, শুআবুল ঈমান [বায়হাকী] ১/৪১৫, হা. ৫৭৬, মুসনাদুল ফিরদাউস ৩/৫৬৪, হা. ৫৭৬৮)

হাদীসটি সহীহ। (আল্লামা সুয়ূতী, জামেয়উস সগীর ৪/১৭০৪, হা. ৮৫০)

চ. আরেক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি বেশি বেশি যিকির করে আল্লাহ তা'আলা তাকে মহব্বত করেন।

عن عائشةؓ من اكثر ذكر الله احبه الله

(কানযুল উম্মাল ১/৪২৫, হা. ১৮২৮, ফয়জুল কাদীর, হা. ৫৬৯৪, জামেউস সগীর ৪/১৭০৪, আততারগীব ফি ফাযায়েলি আমাল [ইবনে শাহীন] ১/৫৭, হা. ১৫৯, আততাইসীর বি শরহিল জামেউস সগীর ২/৪০৪)

হাদীসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও (জামেউস সগীর) শাওয়াহেদের কারণে তা শক্তিশালী হয়ে যায়। (তাবরানী কাবীর ২৫/১২৯, হা. ১৩১১)

ছ. রাসূলুল্লাহ (সা.) এক সফর হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। এক স্থানে পৌঁছে তিনি বললেন, অগ্রগামী লোকেরা কোথায়? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, কতিপয় দ্রুতগামী লোক আগে চলে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ওই সমস্ত অগ্রবর্তী লোকেরা কোথায়, যারা আল্লাহর যিকিরে পাগলপারা হয়ে মশগুল থাকে। যে ব্যক্তি চায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করে খুব তৃপ্তি লাভ করবে, সে যেন বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করে।

عن معاذ بن جبلؓ قال بينما نحن نسير مع رسول الله ﷺ اذ قال رسول الله ﷺ اين السابقون؟ قالوا مضى ناس وتخلف ناس قال اين السابقون الذين يشتهرون بذكر الله؟ من احب ان يرفع فى رياض الجنة فليكثر ذكر الله

(মুজামুল কাবীর ২০/১৫৭, হা. ৩২৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৫, হা. ১৬৭৮৫)

হাদীসটি হাসান।

হাদীস নং ৫ :

عن ابى موسىؓ قال قال النبى ﷺ مثل الذين يذكر ربه والذين لا يذكر ربه مثل الحى والميت۔

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে ব্যক্তি করে না এই দুজনের উদাহরণ হলো জীবিত আর মৃতের মতো। যে যিকির করে সে জীবিত আর যে যিকির করে না সে মৃত। (বুখারী ২/৯৪৮ হা. ৬৪০৭, মুসলিম ১/২৬৫, হা. ৭৭৯, শু'আবুল ঈমান ১/৪০১, হা. ৫৩৬, তাফসীরে দুররে মনসূর ২/৬৯৮)

হাদীস নং ৬ :

عن ابى موسىؓ قال رسول الله ﷺ لو ان رجلا فى حجره دراهم يقسمها و اخر يذكر الله لكان الذاكر لله افضل

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যদি কোনো ব্যক্তির নিকট অনেক টাকা-পয়সা থাকে এবং সে এগুলোকে দান করতে থাকে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে তবে যিকিরকারী ব্যক্তিই উত্তম হবে।

(মুজামুল আওসাত ৬/১৮৫, হা. ৫৯৬৭, তাফসীরে দুররে মনসূর ১/৩৬৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৪, হা. ১৬৭৫১)

হাদীসটি সহীহ। কারণ এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৪)

ক. এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও বান্দার ওপর প্রতিদিন ছদকা হতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার যোগ্যতা অনুসারে কিছু না কিছু দেওয়া হয়ে থাকে।

عن ابى ذرؓ عن النبى ﷺ انه قال: مَا مِنْ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنٌّ يُمُنُّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/২৩৭, হা. ৩৭১৯, আদ দু'আ [তাবরানী] ১/৪২০, হা. ১৮৫৭, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ২/৫৯, মুসনাদে বাযযার ৭/৩৩৫, হা. ৩৮৯০, তারগীব ২/২৫৭, হা. ২২২১)

হাদীসটি হাসান।

খ. এক হাদীসে আছে, "আল্লাহ তা'আলার উত্তম বান্দা তারা, যারা আল্লাহর যিকিরের জন্য চন্দ্র, সূর্য ও ছায়ার প্রতি লক্ষ রাখে।

হাদীসটির মূল ইবারত :

قال رسول الله ﷺ ان خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والاظلة لذكر الله

(মুসতাদরাকে হাকেম ১/১১৫, হা. ১৬৩, সুনানুল কুবরা বায়হাকী ১/৫৫, হা. ১৭৮১, হিলয়াতুল আওলিয়া ৭/২২৭)

হাদীসটি সহীহ। (মুসতাদরাকে হাকেম ১/১১৫, হা. ১৬৩)

গ. এক হাদীসে আছে, "জমিনের যে অংশে আল্লাহর যিকির করা হয় সে অংশ সাত তবকা নিচ পর্যন্ত অন্যান্য অংশের ওপর গর্ব করে থাকে।

হাদীসটির আরবী ইবরাত :

مامن بقعة يذكر الله عليها بصلاة او بذكر الاستبرت بذلك الى منتها ها الى سبع ارضين وفخرت على ما حولها من البقاع ومامن عبد يقوم بصلاة من الارض يريد الصلاة الا تزخرفت له الارض۔

(মুসনাদে আবী ইয়ালা ৪/১৪৮, হা. ৪০৯৬, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৯, হা. ১৬৭৮১, মুজামুল কাবীর তাবরানী ১১/১৯৪, হা. ১১৪৭০)

হাদীসটি হাসান। কারণ একই অর্থে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস নং ৭ :

عن معاذبن جبل قال قال رسول الله ﷺ ليس يتحسر اهل الجنة الا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله تعالى فيها۔

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর জান্নাতবাসীদের দুনিয়ার কোনো জিনিসের জন্য আফসোস বা আক্ষেপ হবে না; শুধুমাত্র ওই সময়টুকুর জন্য আফসোস হবে, যা দুনিয়াতে আল্লাহর যিকির ছাড়া কাটিয়েছে।

(আল মুজামুল কাবীর ২০/৯৪ হা. ১৮২, শুআবুল ঈমান বায়হাকী ১/৩৯২ হা. ৫১২, ৫১৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৪, হা. ১৬৭৪৬, তাফসীরে দুররে মানসূর ১/৩৬৩)

হাদীসটি সহীহ। কারণ এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৪)

উক্ত হাদীসের সমার্থবোধক যে হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

مامن ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها الا تحسر عليها

(শুআবুল ঈমান ১/৩৯২, হা. ৫১১ [হযরত আয়েশা (রা.)] তাফসীরে দুররে মানসূর ১/৩৬৩, তারগীব তারহীব ২/২৬৩, মুসনাদে আহমদ ২/৪৬৩, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৯২ [হযরত আবু হুরায়রা রা.])

হাদীসটি সহীহ। কারণ এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (আল মাওসুআতুল হাদীসিয়্যাহ ১৬/৪৩)

হাদীস নং ৮ :

عن ابى هريرةؓ وابى سعيدؓ انهما شهدا على رسول الله ﷺ انه قال لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ـ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও হযরত আবু সাঈদ (রা.) দুজনই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন, যে জামা'আত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে, ফেরেশতারা তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে নেয়। আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়। তাদের ওপর ছকীনা নাযিল হয়। আর আল্লাহ তা'আলা নিজ মজলিসে (গর্ব করে) তাদের আলোচনা করেন।

(মুসলিম ২/৩৪৫, হা. ২৭০০, তিরমিযী ২/১৭৫, হা. ৩৩৭৮, মুসনাদে আহমদ ২/৪৪৭, হা. ৯৭৮৬, ইবনে আবী শায়বা ১০/৩০৮, হা. ৩০০৮৯, ইবনে মাজাহ ২৬৮, হা. ৩৭৯১, শুআবুল ঈমান ১/৩৯৮, হা. ৫৩০, দুররে মনসূর ১/৩৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

এই হাদীসের সাথে উল্লিখিত আরেকটি হাদীস হলো

وفى حديث طويل لابى ذر اوصيك بتقوى الله فانه رأس الامر كله وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله فانه ذكر لك فى السماء ونور لك فى الارض

হযরত আবু যর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার নসীহত করছি। কেননা তা সমস্ত বিষয়ের মূল। কোরআনে পাকের তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরের এহতেমাম করো। এর দ্বারা আসমানে তোমার আলোচনা হবে এবং জমিনে তা তোমার জন্য নূর হবে।

(জামেউস সগীর [ফয়জুল কাদীর], হা. ২৩৫৯, মুজামুল কাবীর ২/১৭৫)

হাদীসটি হাসান।

ক. হাদীসে আছে, 'যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাত তৈরি করার পর হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে ইরশাদ করলেন, যাও, জান্নাত দেখে আসো। তিনি জান্নাত দেখে এসে বললেন, হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম, এ জান্নাতের খবর যে-ই পাবে, সে তাতে প্রবেশ করবেই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বিভিন্ন কষ্ট দ্বারা ঢেকে দিলেন। যেমন–নামায রোযা, হজ, জিহাদ ইত্যাদি। এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন–যাও, এবার দেখে আসো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দেখে এসে বললেন, হে আল্লাহ! এখন তো আমার ভয় হচ্ছে যে, কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনিভাবে জাহান্নাম তৈরি করার পর হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তা দেখে আসার জন্য বললেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) জাহান্নামের আযাব, দুঃখ-কষ্ট ও দুর্গন্ধময় অবস্থা দেখে এসে বললেন, হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম, যে ব্যক্তি জাহান্নামের অবস্থা জানতে পারবে সে কখনও এর কাছে যাবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে দুনিয়ার মোহ ও বিভিন্ন খাহেশের বস্তু দ্বারা ঢেকে দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী, যেনা, শরাব, জুলুম ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বললেন, এবার দেখে আসো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দেখে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! এখন তো আমার আশংকা হচ্ছে যে, কেউ জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে না।

এর মূল ইবারত হলো :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ": لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ :اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ :أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ، ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ :أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ " قَالَ " :فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ :يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ :أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا، فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ :يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ :أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا "

(তিরমিযী ২/৮৩, হা. ২৫৬০, আবু দাউদ ২/৬৫২, হা. ৪৭৪৪, নাসাঈ ২/১৪১, হা. ৩৭৯৪)
হাদীসটি সহীহ। (তিরমিযী ২/৮৩)

খ. যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– 'ফেরেশতাদের একটি জামা'আত বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকে। যেখানেই তারা যিকিরের আওয়াজ শুনতে পায় অন্য সঙ্গীদের ডেকে বলে–আসো, এখানে আসো, তোমরা যে জিনিস তালাশ করছো, তা এখানে রয়েছে। তখন তারা একজনের ওপর আরেকজন একত্রিত হতে থাকে। এভাবে তাদের হালকা বা ঘেরাও আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
হাদীসের মূল ইবারত :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ لِلَّـهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا :هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ "قَالَ :فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ " :فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُولُ عِبَادِى؟ قَالُوا :يَقُولُونَ :يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ "قَالَ " :فَيَقُولُ :هَلْ رَأَوْنِى؟ "قَالَ ": فَيَقُولُونَ :لاَ وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ؟ "قَالَ " :فَيَقُولُ :وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِى؟ "قَالَ " :يَقُولُونَ :لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا "قَالَ ": يَقُولُ :فَمَا يَسْأَلُونِى؟ "قَالَ :يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ قَالَ ": يَقُولُ :وَهَلْ رَأَوْهَا؟ "قَالَ " :يَقُولُونَ :لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا "قَالَ " :يَقُولُ :فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ "قَالَ ": يَقُولُونَ :لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ :فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ "قَالَ ": يَقُولُونَ :مِنَ النَّارِ "قَالَ " :يَقُولُ :وَهَلْ رَأَوْهَا؟ "قَالَ ": يَقُولُونَ :لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا "قَالَ " :يَقُولُ :فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ "قَالَ " :يَقُولُونَ :لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً "قَالَ " :فَيَقُولُ :فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ "قَالَ " :يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلاَئِكَةِ :فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ .قَالَ :هُمُ الجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ "

(বুখারী ২/৯৪৮, হা. ৬৪০৮, মুসলিম ২/৩৪৪, হা. ৬৭৮০, তিরমিযী ২/২০০, হা. ৩৬০০)
হাদীসটি মুত্তাফাক আলাইহি।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

অন্যের হকের ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত :

সাহাবায়ে কেরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথাও তাশরীফ নিয়ে গেলে এমন নিম্নস্বরে সালাম দিতেন, যাতে কেউ ঘুমন্ত থাকলে ঘুম ভেঙে না যায়, জেগে থাকলে শুনতে পারে। বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, রাসূল (সা.) নিজের ছোটদের বেলায়ও এরূপ সচেতন ছিলেন। কিন্তু আমাদের অবস্থা কী? আমরা তো আমাদের বড়দের ব্যাপারেও এরূপ সচেতন থাকি না। বড় বলতে বয়সে হোক, আমলের ক্ষেত্রে হোক বা আত্মীয়তার ক্ষেত্রে। কারো ব্যাপারে আমরা এরূপ সচেতন থাকি না। তাদের আরামের ব্যাপারে চিন্তা করি না। হ্যাঁ কিছু লোক তো থাকবেই, যারা এসবেরও খেয়াল করে থাকে।

প্রত্যেকে চায় নিজের উদ্দেশ্যে কিভাবে পূর্ণ হবে। এসব কী! ছোটরাও চায় আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হোক, আমার কাজটা আগে সেরে নিই। কারো কষ্ট বা অনিষ্ট, এসবের দিকে লক্ষ রাখা হয় না। এরূপ চিন্তাধারা অবশ্যই ভুল। প্রত্যেকের অধিকার বা হকের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

দু'আর হাকীকত

দু'আ বড় জিনিস। আজ দুনিয়ার সব কাজ দু'আর হাকীকতের ওপর হচ্ছে। দু'আর হাকীকত কী? যে মহান সত্ত্বা সর্বপ্রকার ক্ষমতার মালিক তার কাছে আরজি পেশ করা। কারো চাকরির প্রয়োজন বা অন্য কিছু প্রয়োজন, তখন সে আবেদনপত্র ও অন্যান্য ফরম পূরণ করে সাথে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়। আপনি দেখবেন সামান্য ট্রেনের টিকিটের জন্য যাত্রীদের লাইন পড়ে যায়। সুতরাং দু'আর হাকীকত হলো যার ক্ষমতায় যেটা আছে, তার কাছে সে ব্যাপারে আরজি জানানো। আল্লাহর কাছেই যেহেতু সব কিছুর ক্ষমতা সুতরাং তার কাছেই আমাদের সব কিছুর ব্যাপারে আরজি জানাতে হবে। দু'আর বরকতে বড় বড় বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বড় থেকে বড় কাজও সহজসাধ্য হয়ে যায়।

প্রত্যেক উদ্দেশ্যের জন্য দু'আর তরীকা

গুরুত্ব সহকারে দু'আ করুন। ফরজ নামাযের পর দু'আ কবুল হয়। দুই রাক'আত নামায পড়ে দু'আ করুন। কোনো হাজত সামনে এলে প্রতিদিন নফল নামায পড়ে দু'আ করতে থাকেন। ইনশাআল্লাহ বড় বড় সমস্যাও সমাধান হয়ে যাবে। কত লোক দু'আর মাধ্যমে হজ করতে পেরেছেন। কেউ বছরের মধ্যেই হজে গিয়েছেন কারো কিছু সময় দেরি লেগেছে। প্রতিদিন দুই রাক'আত নামায পড়ুন এবং এরপর দু'আ করুন। শিশু যদি বারবার কোনো কিছু চায় তখন আপনি নিজেও তার প্রতি মনোনিবেশ করে থাকেন। ফকীররা বারবার আপনার ঘরের কড়া নাড়ে, ভিক্ষা চায়। আপনিও আল্লাহর কাছে বারবার প্রার্থনা করুন, দু'আ করতে থাকেন।

দু'আ হলো অন্তরের ডাক

দু'আর ব্যাপারে আরেকটি কথা হলো দু'আ যেমন গুরুত্ব সহকারে করবেন তেমনি অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে করবেন। দু'আর সময় অন্তরকে অলস রাখবেন না। কারণ অলস অন্তরের দু'আ কবুল হয় না। দু'আ হলো অন্তরের ডাক। কেউ হাত তুলে দু'আ করছে কিন্তু তার চিন্তা অন্যদিকে। এটি দু'আ হবে না। যেমন–কারো কাছে একটি দরখাস্ত পেশ করতে হবে। সুন্দর কম্পিউটার টাইপ করে ঝকঝকে কাগজে প্রিন্ট করে দরখাস্তটা তৈরি করা হলো। সুন্দর ভাষা, চিত্তাকর্ষক লেখা। কিন্তু দরখাস্ত দেওয়ার সময় যদি মুখটা ফিরিয়ে রাখা হয় তবে কী অবস্থা হবে? তার দরখাস্ত কবুল হবে নাকি বেআদব প্রমাণিত হবে? বরং বলা হবে দরখাস্তটা পেশ করার যোগ্যতাও তার মাঝে নেই। তেমনি দু'আর সময় যদি অন্তর অলস থাকে, আল্লাহর দিকে মনোনিবিষ্ট না হয় সেরূপ দু'আ আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার যোগ্য হবে না। তাই দু'আর সময় কায়মনোবাক্যে দু'আ করা উচিত।

সময় সাপেক্ষে দু'আ করা

যখন যেরূপ সময় পাওয়া যায়, সে অনুপাতে দু'আ করে নেওয়া উচিত। যদি সময় কম হয়, তবে নাতিদীর্ঘ দু'আ করবে। যদি বেশি হয় তবে লম্বা দু'আ করবে। যেমন–সূরায়ে ফাতেহাতে ছোট ছোট অনেক দু'আ আছে। সেখান থেকে একটিও করা যায়। যেমন–

اهدنا الصراط المستقيم 'আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।" শুধু এটিও পাঠ করা যায়।

আল্লাহ না চাইলে কিছুই হওয়ার নয়

হেদায়াত আল্লাহর হাতে। দেখেন, এখানে বাল্ব যে আলো ছড়াচ্ছে তার নিয়ন্ত্রণ কিন্তু পাওয়ার হাউসের সাথে। পাওয়ার হাউস যখন চায় কাউকে আলোকিত করে, কাউকে অন্ধকারে রাখে। বটন টিপ দিলেই যে আলোকিত হবে, তা নয়। বরং পাওয়ার হাউসের সম্পৃক্ততা লাগবে। তেমনি হেদায়াতের আলো। আল্লাহ যখন করুণা করে কাউকে হেদায়াত দেবেন, সে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। হেদায়াত আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে। আমাদের চাইতে হবে, দু'আ করতে হবে, দেওয়ার মালিক আল্লাহ তা'আলা।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

ইহয়ায়ে সুন্নাত ইজতিমায় দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ বয়ান থেকে সংগৃহীত

আত্মশুদ্ধির পথে করণীয়

আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি বোঝার উপায়

দেখুন! প্রকৃত দ্বীনদার হওয়ার জন্য আত্মশুদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ে মানুষ আত্মশুদ্ধির জন্য কোনো পীরের হাতে মুরিদ হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে। অথচ মুরীদ হওয়া কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে পারে না। একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তো আত্মশুদ্ধী। আজকাল মানুষ আসল উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে তা অর্জনের উপকরণের পেছনে সময় ব্যয় করতে ব্যস্ত। অথচ বাস্তব কথা হলো, আত্মশুদ্ধি ভিন্ন কোনো তরীকায়ও হতে পারে। ইমাম গাজালী (রহ.)-এর একটি বাণী স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি বলেন, "যখন কোনো ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে এ কথা জানতে আগ্রহী হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট? তাহলে সে যেন ভেবে দেখে যে, দ্বীনি ও পার্থিব কাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পর যতটুকু অবসর সময় সে পায়, সে ওই সময়কে কী কাজে ব্যয় করে?

এটি একটি ভুল ধারণা

এ ধারণা ভুল যে, তাসাওউফ শুধুমাত্র তাদের জন্য, যারা বেকার! মূলত এ পথে আলেম, তালেবে ইলম নির্বিশেষে সকলেই মেহনত অনুপাতে সফলতার মুখ দেখে থাকে।

দেখুন! এক তালেবে ইলম একজন বুজুর্গের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল যে, হযরত! আমার আন্তরিক চাহিদা হলো আপনার হাতে বায়আ'ত গ্রহণ করে তাসাওউফের স্বাদ আস্বাদন করি। কিন্তু ভয় হয় যে, তাসাওউফের লাইনে অনেক বেশি মুজাহাদাহ করতে হয়, যা আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হয়। আমার তো মুজাহাদা করার মতো সময়ও নেই। কারণ আমি ইলমে দ্বীন আহরণে ব্যস্ত। ফলে সুযোগ হয়ে ওঠে না। তালেবে ইলমের কথা শুনে বুজুর্গ হাসতে লাগলেন এবং বললেন–ঠিক আছে, তোমাকে কোনো কঠিন কাজের কথা বলব না। শুধুমাত্র দুটি কাজের কথা বলব। ব্যস! এ দুটি কাজ করতে থাকো, সফল হবে। এক. অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম পরিহার করো। দুই. তাকওয়া অবলম্বন করো। একটু ভেবে দেখুন, এই বুজুর্গ দুটি বাক্যের মধ্যে দুনিয়া-আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণকে গেঁথে ফেলেছেন। বাস্তবতা হলো এই যে, মানুষ যখন একটু সতর্ক হয়ে অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকবে, তখন অটোমেটিক সে সব ধরনের গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে। যেমন–অনর্থক কথা পরিহার করা। অর্থাৎ প্রতিটি কথা বলার আগেই ভেবে দেখবে যে, এই কথার মধ্যে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো ফায়দা আছে কি না? থাকলে বলবে, আর না থাকলে বলবে না। অনুরূপ কোনো মজলিসে বসার আগে ভেবে বসবে যে এখানে যা শুনতে হবে, তা আদৌ কল্যাণকর হবে কি না? খানাপিনার মধ্যেও যা স্বাস্থ্যসম্মত ও উপকারী, তা খাবে। লোভের বশবর্তী হয়ে যা পাবে, যা আসবে তা দ্বারাই উদরপূর্তি করবে না।

পত্রপত্রিকা পড়া

বর্তমানে আমাদের অনেকের অনেক সময় তো পত্রপত্রিকা অধ্যয়ন, গল্পগুজব ও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে অতিবাহিত হয়ে যায়। পত্রপত্রিকা পড়া গোনাহের কাজ নয়। তবে সব পত্রিকা ও পত্রিকার সবপৃষ্ঠার হুকুম এক নয়, বরং কিছু পত্রিকা ও পৃষ্ঠা দেখা বা পড়া গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন নেই। ব্যবসায়ী স্বার্থে বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর দেখার মতো হলে পত্রিকা পড়ার মধ্যে ক্ষতি নেই। অনেকে এমন আছে, পত্রিকা পড়া যাদের নেশায় পরিণত হয়েছে, পত্রিকা না হলে তাদের ঘুম, খাওয়া, পড়ালেখা–কিছুই ভালো লাগে না। এমনটি যেন না হয়।

অন্যের দোষ চর্চায় লিপ্ত হওয়া

দু-চারজনের মজলিস বসে অন্যের দোষ চর্চা এবং অযথা সময় নষ্ট করার প্রবণতা তো মহামারির আকার ধারণ করেছে। এ ধরনের অবসর সময়ে যখন কোনো কাজ হাতে থাকে না,

তখন কোনো অনর্থক-অকাজে লিপ্ত না হয়ে একটু ভেবে দেখুন যে কাল হাশরে বিচারদিনের মালিকের সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, সে দিনের জন্য আমি কি প্রস্তুত? এতটুকু যে করতে পারবে সে অনর্থক কথাবার্তা, কাজকর্ম থেকে বেঁচে আখেরাতের কিছু সামানা সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। ইনশা আল্লাহ।

দ্বিতীয় কথা, তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য বলা হয়েছে, এটা তো সমস্ত নেক কাজের মূল ভিত্তি। ফরজ, ওয়াজিব আদায় করে হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকো, আখেরাতের ফিকির করো, আল্লাহকে ভয় করো। এগুলো মেনে চলার নামই তাকওয়া। প্রতিটি মানুষের সফলতার জন্য এ দুটি উপদেশবাণীই যথেষ্ট। আরে ভাই! এটা তো এমন একটি সবক, যাকে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবলম্বন করে সিরাতে মুস্তাকীমের ওপরে চলতে পারে।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

نعمتان مغبون فيهما كثر من الناس الصحة والفراغ

অর্থাৎ দুটি বিশেষ নেয়ামত থাকাবস্থায় মানুষ তার মূল্যায়ন করে না। হারানোর পর মূল্যায়ন করে। একটি হলো সুস্থতা, দ্বিতীয়টি হলো অবসর সময়। অসুস্থ হলেই সুস্থতার কদর বুঝে আসে। আর যখন কাজের অনুপযোগী হয়ে যায় তখনই সুস্থতার কদর বুঝতে পারে। আর এ দুটি নেয়ামতের যথাযথ কদর তখনই হবে, যখন মানুষ নিজের আমলের হিসাব করবে এবং আখেরাতের ফিকির করবে।

রাসূল (সা.) অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেন–

اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك

অর্থাৎ পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে লুফে নাও। (১) যৌবনকে বার্ধক্য আসার পূর্বে। (২) সুস্থতাকে অসুস্থ হওয়ার পূর্বে। (৩) সম্পদকে দরিদ্র হওয়ার পূর্বে। (৪) অবকাশকালীন সময়কে ব্যস্ততা আসার আগে। (৫) জীবনকে মৃত্যু আসার পূর্বে। (তিরমিযী)

দেখুন! যৌবনকে এ জন্য গণীমত বলা হয়েছে যে যৌবনে মানুষের মনোবাসনার দৃঢ়তা, শক্তি-সামর্থ্য–সব কিছু থাকে, যা চায় তাই করতে পারে। ফলে যৌবনে যত নেক কাজ করতে চায়, করতে পারে। কিন্তু যখন বার্ধক্য আসে, তখন শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে যায় এবং হিম্মত টুটে যায়। প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকলেও কাজ করার শক্তি থাকে না। ফলে আক্ষেপ করে বলতে হয়–আহ! যদি যৌবনে এ ইবাদতটি করে নিতাম!

সুস্থতাকে গণীমত এই জন্য বলা হয়েছে যে কেউ যদি মনে করে আমার যৌবন এখনো ১৫-২০ বছর অবশিষ্ট রয়েছে, সুতরাং তাড়া কিসের? হ্যাঁ, তবুও তাড়া করতে হবে। কারণ আগামী ১৫-২০ বছর সুস্থ থাকবেন, এটার গ্যারান্টি কিসের? মানুষ তো কোনো না কোনো অসুখে ভুগতেই থাকে। আল্লাহ না করুন হঠাৎ কোনো জটিল রোগে আক্রান্ত হলে তখন আমল করার সুযোগ কোথায় পাবেন?

অবসর সময়কে গণীমত এ জন্য বলা হয়েছে যে, ব্যস্ততা মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় আযাব, যার অক্টোপাসে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। এ যুগের ফ্যাশনই আমাদের ব্যস্ততার আযাব। বর্তমান যুগের যুবকদের পরিপাটি হতে এবং সাজগোজের মধ্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় হয়ে যায়। যত সব অনর্থক কাজকে আবশ্যকীয় জিনিসের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

ধন-সম্পদকে এ জন্য গণীমত বলা হয়েছে যে মাল-সম্পদ মূলত ছায়ার মতো। এই আছে, এই নেই। অতএব সম্পদ থাকতেই যদি আখেরাতের ডিপোজিটে জমা করে রাখো, তাহলে আখেরাতে তা সংরক্ষিত পাবে। বর্তমানে আমরা সাধারণত ধনী বলতে ওই ব্যক্তিকে বুঝি, যে অঢেল সম্পদের মালিক, বড় বড় মিল-কারখানার মালিক, বাড়ি-গাড়ির মালিক। কিন্তু প্রকৃত ধনী তো সে, যার আখেরাতে কিছু জমা থাকে।

উল্লিখিত চারটি জিনিস একটির পর একটি আসবেই সন্দেহ নেই। এখন যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি সারা জীবন সম্পদশালী ছিল, এমনকি মৃত্যুর সময়ও। দারিদ্র্যতা কী জিনিস জীবনে সে একবারও দেখেনি? একটু ভেবে দেখুন! মৃত্যুর সময় তো তার সমস্ত মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। দুনিয়া থেকে তার বিদায় তো চরম অসহায় ও দারিদ্র্যের বেশেই হয়েছে। বলুন! সে কি তার সাথে তার কোনো সম্পদ নিতে পেরেছে? অবশ্যই না। তবে হ্যাঁ,

জীবদ্দশায় আখেরাতের জন্য যা জমা রেখেছে, তাই নিতে পেরেছে। এটাই এখন তার কাজে আসতে পারে।

প্রকৃত ফকীর

আজ আমরা ফকীর ওই ব্যক্তিকে মনে করি, যার কাছে কোনো পার্থিব সম্পদ নেই। অথচ আল্লাহর হাবীব (সা.) ইরশাদ করেন–"ফকীর তো ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় অনেক নেক আমল নিয়ে যায়; কিন্তু দুনিয়াতে অন্যের হকের কোনো পরোয়া করেনি। কিয়ামতের দিন যখন মিজানের সময় আসবে, তখন তার হকদাররা আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করবে যে তার থেকে আমাদের হক উসূল করে দিন। (সেখানে টাকা-পয়সা থাকবে না) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন যে তার নামায নিয়ে যাও, অতঃপর কিছু লোক আসবে, যাদের সে গীবত করেছিল। আল্লাহ তাদের হকের বদলে তার রোজা, নফল ইবাদতসমূহ, উমরা ও হজের সাওয়াব দিয়ে দেবেন। এভাবেই সে সাওয়াবশূন্য হয়ে যাবে। এরপর যখন আরো কোনো হকদার আসবে, তখন হুকুম হবে, তার নেকী খতম হয়ে গেছে এখন তোমরা নিজেদের গোনাহ তার মাথায় চাপিয়ে দাও। এভাবেই সে নেকীর পাহাড় নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েও গোনাহের পাহাড়ে চাপা পড়বে। প্রকৃত দারিদ্র্য তো সেই।

জীবনকে গণীমত এ জন্য বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রকারে আমলের স্থান হলো দুনিয়া। বর্তমানে মানুষের জীবন তো ডিজিটাল হয়ে গেছে। বটন চাপলেই কাজ হয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুও আসে। কথার মাঝে, কাজের মাঝে, সফরে, ঘরে, হঠাৎ চোখের পলকে হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তি লাশে পরিণত হচ্ছে, সুতরাং শ্বাসপ্রশ্বাস বন্দ হওয়ার আগেই কিছু করে নাও। নচেৎ আক্ষেপ করতে হবে যে, কিছু আমল করার যদি সুযোগ পেতাম। কিছু করতে পারো আর নাইবা পারো অবসর সময়গুলোতে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকো। অনর্থক কথাবার্তা, কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকো। আখেরাতের ফিকির করো। ইনশাআল্লাহ সফলতা ধরা দেবেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বেশি বেশি নেক আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সংকলন ও গ্রন্থনা :
মুফতী নুর মুহাম্মদ

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta RoadHatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424, Mobile: 01675303592, 01711527232

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 0980/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039, Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

শরীয়তের দৃষ্টিতে আকীকা, খতনা ও কাফন-দাফন

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

আকীকা প্রসঙ্গ

আকীকা করা মুস্তাহাব এবং এর দাওয়াত কবুল করা জায়েয। (ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহ ২/৯১)

ছেলে বা মেয়ের জন্মের পর সপ্তম দিবসে আকীকা করা উত্তম। সপ্তম দিনে না করতে পারলে পরে যেকোনো দিন করতে পারবে। তবে সপ্তম দিন যে বার ছিল সেই বারে করা ভালো। হযরত ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে তার আকীকা করো এবং তার জন্য সুন্দর নাম রাখো। (তাবারানী আউসাত, হা. ১৯৮১)

ছোট বয়সে যদি আকীকা করা না হয়, তাহলে যেকোনো বয়সে নিজের আকীকা নিজে করতে পারবে। হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবী হওয়ার পর নিজের জন্য আকীকা করেছেন। (তাবারানী আউসাত, হা. ৯৯৪)

কয়েকটি জরুরি মাসআলা

১. আকীকার মধ্যে ছেলেসন্তানের জন্য দুটি বকরি আর মেয়েসন্তানের জন্য একটি বকরি জবাই করা উত্তম। ছেলের জন্য দুটি বকরি সম্ভব না হলে একটিই যথেষ্ট। (রদ্দুল মুহতার-৫/২১৩)

২. কেউ যদি কুরবানীর গরুর মধ্যে আকীকা করতে চায়, তাহলে সে ছেলের জন্য দুই অংশ আর মেয়ের জন্য এক অংশ বরাদ্দ করবে। ছেলের জন্য দুই অংশ সম্ভব না হলে এক অংশ বরাদ্দ করতে পারে। (রদ্দুল মুহতার ৫/২১৩)

৩. গরু ও উট দ্বারা একাধিক বাচ্চার আকীকা করা জায়েয আছে। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ২/৯১)

৪. আকীকা করা মুস্তাহাব। কেউ যদি আকীকা না করে তাহলে সে গোনাহগার হবে না। (ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ২/৯১)

৫. যে পশু দ্বারা কুরবানী করা বৈধ, সেই পশু দ্বারা আকীকা করতে হয়। যেমন : ছাগল ও ভেড়া এক বছরের হতে হবে। আর গরু ও মহিষ দুই বছরের হতে হবে। (রদ্দুলল মুহতার ৫/২১৩)

৬. আকীকার গোশত কাঁচা বণ্টন করা বা রান্না করে বণ্টন করা অথবা দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো কিংবা কাউকে না খাওয়ানো–সবই জায়েয আছে। আর আকীকার গোশত ধনী-গরিব সবাই খেতে পারবে। (রদ্দুল মুহতার ৫/২১৩)

৭. আকীকার চামড়ার মূল্য কুরবানীর চামড়ার ন্যায় সদকা করে দিতে হবে।

আকীকার ফযীলত

আকীকার দ্বারা বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। (বুখারী ২/৮২২)

জন্মের সপ্তম দিবসে কয়েকটি করণীয় কাজ

১.আকীকা করা। (তাবারানী আউসাত, হা. ১৯৮১)

২. শিশুর সুন্দর নাম রাখা। (প্রাগুক্ত)

৩. পশু জবাইয়ের আগে বা পরে বাচচার মাথার চুল মুণ্ডানো। (তুহফাতুল মাওদূদ বিআহকামিল মাওলূদ, পৃ. ৮৮)

৪. সম্ভব হলে চুলের ওজন সমপরিমাণ সোনা বা রুপা দান করা। (প্রাগুক্ত)

৫. আকীকার গোশত দাওয়াত করে খাওয়ানো। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩)

খতনা প্রসঙ্গ

খতনা করা সুন্নাত। এটি ইসলামের

একটি গুরুত্বপূর্ণ শি'আর বা নিদর্শন। জন্মের পর থেকে বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো সময় খতনা করা যায়। তবে সাত বছরের আগে করানো উত্তম ও মুস্তাহাব। (ফাতাওয়ায়ে আলম গীরী ৫/৪৩৬)

যদি বালেগ হওয়ার পূর্বে কারো খতনা না হয়ে থাকে বা কোনো অমুসলিম বালেগ হওয়ার পর মুসলমান হয়, তাহলে বালেগ হওয়ার পর খতনা করার হুকুম বাকি থাকবে এবং তাকে খতনা করানো হবে যদি তার মধ্যে খতনার কষ্ট সহ্য করার মতো ক্ষমতা থাকে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২৩৮)

খতনার পরিমাণ

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে যে চামড়া রয়েছে তার অর্ধেকের চেয়ে বেশি কাটা হলে তাকে খতনা বলা হবে। আর অর্ধেক বা তার চেয়ে কম কাটা হলে তাকে খতনা বলা হবে না। সুতরাং যদি কাউকে খতনা করানোর পর তার অগ্রভাগের চামড়া লম্বা হয়ে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগকে প্রায় ঢেকে নেয়, তাহলে তাকে দ্বিতীয়বার পুনরায় খতনা করাতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ১০/৫১৫)

প্রচলিত একটি ভুল

অনেক জায়গায় খতনা উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর জন্য বিরাট আকারে খানাপিনার আয়োজন করা হয় এবং সেখানে ছেলেদের জন্য কাপড়চোপড় ও হাদিয়া-তোহফা নিয়ে আসা হয়, এসব সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। এ ধরনের অনুষ্ঠান না করাই ভালো। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, হযরত উসমান ইবনে আবিল আস (রাযি.)-কে কোনো এক খতনার অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হলো, তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন না। পরে যখন তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম)-এর যুগে আমরা খতনার দাওয়াতে যেতাম না এবং আমাদেরকে এর জন্য দাওয়াতও দেওয়া হতো না। তবে কুসংস্কারমুক্ত হলে এ ধরনের দাওয়াতে শরীক হওয়া এবং এ উপলক্ষে বাচ্চাকে হাদিয়া দেওয়া নাজায়েয নয়। (মুসনাদে আহমাদ, হা. ১৭৯০৮, তাবারানী কাবীর, হা. ৮৩৮১, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হা. ৬২০৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : ৫/৪০৩)

আলাহ তা'আলা আমাদেরকে করণীয় কাজগুলো করার এবং বর্জনীয় কাজগুলো বর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কবর খনন ও দাফনের শরয়ী পদ্ধতি

কোনো মুসলমান মারা গেলে তাকে কবরে দাফন করা ইসলামের অন্যতম শিআর বা বিশেষ নিদর্শন এবং ফরযে কিফায়াহ। তথা কিছু লোক এই ফরয হুকুম আদায় না করলে সকলেই গোনাহগার হবে। আর কিছু লোক আদায় করলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ হুকুম সঠিকভাবে পালন করা যেহেতু জরুরি, তাই আমরা এর সাথে সম্পর্কিত কবর খনন করার এবং কবরে মাইয়্যেতকে দাফন করার শরঈ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

জেনে নেওয়া উচিত যে, কবরের সর্বমোট গভীরতার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম গঠনের কোনো ব্যক্তির অর্ধদেহ থেকে বুক বা পূর্ণদেহ পর্যন্ত এবং উক্ত ব্যক্তির বুক পর্যন্ত কবর গভীর হওয়া উত্তম আর পূর্ণদেহ পর্যন্ত হওয়া অধিক উত্তম, তবে পূর্ণদেহ থেকে বেশি গভীর না হওয়া উচিত। আর কবরের সর্বাধিক প্রস্থ হচেছ মাইয়্যেতের অর্ধদেহ পর্যন্ত। আর দৈর্ঘ্য হচ্ছে মাইয়্যেতের পূর্ণদেহ পর্যন্ত। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৬৬, রদ্দুল মুহতার ৩/১৪১)

শরীয়তের দৃষ্টিতে কবর দুই প্রকার (ক) বগলী কবর (খ) সিন্দুক কবর। যে স্থানে মাইয়্যেতকে দাফন করা হবে সে স্থানের মাটি শক্ত ও মজবুত হলে সেখানে বগলী কবর খনন করা উত্তম, পক্ষান্তরে ওই স্থানের মাটি নরম হওয়ার দরুন বগলী কবর দেবে যাওয়ার আশংকা হলে সিন্দুক কবর খনন করা উচিত। (আহকামে মাইয়্যেত, পৃ. ৮৩) আমাদের দেশের মাটি নরম হওয়ার দরুন বগলী কবর খনন করা ঝুঁকিপূর্ণ, তাই সাধারণত সিন্দুক কবর খনন করা হয়।

সিন্দুক কবর খনন ও তাতে মাইয়্যেতকে দাফনের শরঈ পদ্ধতি এই যে, কবরের পূর্ণ গভীরতার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ খনন করার পর ঠিক মাঝামাঝি মাইয়্যেতকে ডান কাতে রাখা যায়, এমন প্রস্থে কবরের শেষ গভীরতা পর্যন্ত মাইয়্যেতের দৈর্ঘ্য অনুপাতে একটি গর্ত খনন করা হবে, তবে উত্তর দিকে মাথা রাখার স্থানে

একটু উঁচু রাখা হবে, যাতে মাইয়্যেতকে ডান কাতে শোয়ালে শরীরের সাথে মাথা সোজা থাকে। অতঃপর এই গর্তে মাইয়্যেতকে রাখার সময় এই দু'আ পড়বে

بسم الله وعلى ملة رسول الله

এবং মাইয়্যেতকে সম্পূর্ণ ডান কাতে শোয়ানো হবে, যাতে তার চেহারা, সীনা ও পুরো শরীর কিবলামুখী হয়ে যায়, অতঃপর নিচের গর্তটি মাইয়্যেতের শরীর থেকে এক বিঘত ওপরে মজবুত বাঁশ, কাঁচা ইট বা কাঠ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে কাঁচা ইট বা সিমেন্ট দ্বারা তৈরীকৃত স্লাব ব্যবহার করা যেতে পারে। অতঃপর মাটি দিয়ে বাকি অংশ ভরাট করে জমিনের ওপর বুক ও মাথা বরাবর স্থানটুকু কুঁজসদৃশ এক বিঘত বা এর চেয়ে সামান্য বেশি পরিমাণ উঁচু করা হবে। আমাদের দেশে সম্পূর্ণ কবর যেভাবে মাটি দিয়ে উঁচু করা হয়, এর কোনো প্রমাণ নেই।

সিন্দুক কবর খননের দ্বিতীয় একটি পদ্ধতি এই যে, মাইয়্যেতকে রাখার গর্তটি একেবারে মাঝে খনন না করে পশ্চিমপার্শ্বে পূর্বের নিয়মে খনন করা হবে এবং মাইয়্যেতকে সুন্নাত তরিকায় রাখা হবে। অতঃপর বাঁশ বা কাঠের একপার্শ্ব কবরের পূর্ব দেয়ালের গোড়ায় রাখা হবে এবং অপরপার্শ্ব কবরের পশ্চিম দেয়ালের সাথে জমিন থেকে আনুমানিক এক হাত নিচে মিলিয়ে রাখা হবে। অতঃপর মাটি দিয়ে বাকি অংশ পূর্বের নিয়মে ভরাট করা হবে। যাতে করে শিয়াল-কুকুর বা অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী লাশের ক্ষতি করতে না পারে। (বজলুল মাজহূদ ৪/২০৫, মুসনাদে আহমাদ, হা. নং-৪৯৮৯, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৬৬, আততাজরীদ ৩/১০৭২, বাদায়েউস সানায়ে ১/৩২০, এমদাদুল আহকাম ১/৮৩৯)

যে স্থানে মাইয়্যেতকে দাফন করা হচ্ছে, সে স্থানের মাটি শক্ত হলে সেখানে বগলী কবর খনন করা উত্তম। বগলী কবর খনন ও তাতে মাইয়্যেতকে দাফনের শরঈ পদ্ধতি এই যে মধ্যম গঠনের কোনো ব্যক্তির বুক বা পূর্ণদেহ পরিমাণ গভীর ও মাইয়্যেতের পূর্ণদেহ সমপরিমাণ দীর্ঘ ও বেশির থেকে অর্ধদেহ পরিমাণ প্রশস্ত একটি কবর খনন করা হবে। অতঃপর ওই কবরের নিচের জমিন বরাবর পশ্চিম দেয়ালে নিচের অংশে মাইয়্যেতের দৈর্ঘানুপাতে ও মাইয়্যেতকে ডানকাতে রাখা যায় এই পরিমাণে একটি গর্ত খনন করা হবে এবং তার মাথা ও কোমর বরাবর মাটি, পাথর বা কাঁচা ইট ইত্যাদি রাখা হবে, যাতে সে চিত হয়ে না পড়ে এবং কিবলার দিক থেকে তার পুরো শরীর সরে না যায়। অতঃপর মজবুত বাঁশ মাটিতে সোজাভাবে গেড়ে ওই গর্ত ঢেকে দেওয়া হবে এবং পুরো কবর মাটি দিয়ে পূর্বের নিয়মে ভরাট করা হবে। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২৩, গুনইয়াতুল মুতামালি, পৃ. ৫৯৮, ইমদাদুল আহকাম ১/৮৩৯)

কিছু করণীয় কাজ

১. মাইয়্যেতের দাফনের কাজে উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য মুস্তাহাব বা করণীয় এই যে প্রত্যেকে দু'হাত দিয়ে কিছু মাটি মাইয়্যেতের মাথার দিক দিয়ে কবরে তিনবার ফেলবে এবং প্রথমবার منها خلقناكم দ্বিতীয়বার ومنها وفيها نعيدكم ও তৃতীয়বার نخرجكم تارة اخرى পড়বে। (মিরকাতুল মাফাতীহ ৪/৭৬, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৬৬)

২. দাফনের কাজ শেষ হওয়ার পর মুস্তাহাব এই যে, একজন মাইয়্যেতের মাথার নিকট সূরা বাকারার শুরু থেকে مفلحون পর্যন্ত এবং পায়ের নিকট সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত তথা امن الرسول থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করবে। (শু'আবুল ঈমান, হা. নং-৮৮৫৪, রদ্দুল মুহতার ২/২৪৩)

কিছু বর্জনীয় কাজ

অনেক এলাকায় দাফনের কাজ শেষ হওয়ার পর কবরের চার কোনায় চারটি খুঁটি গাড়ার এবং চার কুল পড়ার প্রথা আছে। কোথাও কবরের মাঝ বরাবর খেজুরের ডাল গাড়া হয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং এই প্রথার অনুসরণ সুন্নাত বা সাওয়াবের কাজ মনে করা বিদআত বা মারাত্মক গোনাহ। (সহীহ বুখারী, হা. নং-২৬৯৭, সহীহ মুসলিম, হা. নং-১৭১৮)

আবার কোনো কোনো জায়গায় কবরে ফুল দেওয়া হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটাও নাজায়েয। (নিযামুল ফাতাওয়া ২/১৭৬, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহ ১/১২৩)

নবীজির (সা.) উত্তম চরিত্রই হোক আমাদের জীবনপাথেয়

মুফতী জামীল আহমদ সাহেব

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد:

اعـوذ بـالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

ن ـ والـقـلـم ومـا يسـطرون ، مـاانت بـنعمت ربك بمجنون وان لك لا جرا غير ممنون ـ وانك لعلى خلق عظيم ـ (صدق الله العظيم)

আল্লাহ তা'আলা সূরা ক্বলামের এই আয়াতগুলোতে তিনটি বস্তুর শপথ করেছেন। ১. কালির দোয়াত ২. কলম এবং ৩. কলম দ্বারা যা লেখা হয়।

শপথের পর একটি বিষয়কে মজবুতভাবে উল্লেখ করছেন। তাহলো 'হে নবী! আপনি পাগল নন।'

আল্লাহ তা'আলার কোনো কথা বলতে শপথের প্রয়োজন নেই। শপথ করা ছাড়া বললে তাও মানা, তার ওপর আমল করা এবং এর ওপর ঈমান আনা আবশ্যক। তার পরও শপথের মাধ্যমে বিষয়টিকে মজবুত করে ইরশাদ করছেন–'নবীজি (সা.) পাগল নন।'

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'আলার এ কথা বলার কারণ কী? কারণ হলো, নবীজি (সা.) যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে মক্কার কাফিরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, আল্লাহর একত্ববাদের কথা বললেন, মূর্তি পূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদাতের আহ্বান জানালেন, তখন মক্কার কাফিররা বলল, মুহাম্মদ (সা.) নতুন কথা বলছে। এতগুলো মূর্তির পূজা করেও আমাদের প্রয়োজন পূরণ হয় না, এক আল্লাহর ইবাদাত করলে কি আমাদের প্রয়োজন পূরণ হবে! মুহাম্মদ (সা.) তো আমাদের বাপ-দাদার ধর্মে আঘাত হানছে। মুহাম্মদ (সা.) পাগল হয়ে গেছে। তার বিবেক-বুদ্ধি সুস্থ নেই।

আল্লাহ তা'আলা মক্কার কাফিরদের সে কথার প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেন এবং বলেন, হে নবী (সা.)! আপনি পাগল নন। আর এ দাবির ওপর সামনের আয়াতে আল্লাহ পাক দুটি দলিল পেশ করছেন।

১। হে নবী! আপনার জন্য স্থায়ী প্রতিদান রয়েছে, যা শেষ হওয়ার নয়। প্রতিদান তাঁকেই দেওয়া হয়, যে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হন। বিবেকহীন ব্যক্তিকে প্রতিদান দেওয়া যায় না। কারণ সে শরীয়তের মুকাল্লাফ নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো নবী (সা.) বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। কেমন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন? ওহাব বিন মুনাব্বেহ (রহ.) বলেন, আকলকে তথা বিবেক-বুদ্ধিকে দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সারা পৃথিবীর সৃষ্টিজীবকে দেওয়া হয়েছে এক ভাগ, বাকি নয় ভাগ নবী করীম (সা.)-কে এককভাবে দান করা হয়েছে।

২। দ্বিতীয় দলিল হলো, 'আপনি মহা উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

পবিত্র কোরআনে তিন ধরনের চরিত্রের (خلق) কথা বলা হয়েছে।

১। خـلـق حسن ২। خـلـق كريم ৩। خلق عظيم

خـلـق حسـن বলা হয়, কেউ মন্দ আচরণ করলে তার সাথে মন্দ আচরণ করা এবং কেউ গালি দিলে তাকে গালি দেওয়া। খুলুকে হাসান দেওয়া হয়েছে হযরত মূসা (আ.)-কে।

خـلـق كـريـم বলা হয়, কেউ মন্দ আচরণ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। কেউ গালি দিলে তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। আর এই চরিত্র দেওয়া হয়েছে হযরত ঈসা (আ.)-কে।

خـلـق عـظيم হলো তিন বস্তুর সমষ্টি। হাদীস শরীফে এসেছে–

صـل مـن قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك

"যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তার সাথে সম্পর্ক করো, যে তোমার ওপর জুলুম করেছে, তাকে ক্ষমা করো, আর যে তোমার সাথে অসৎ আচরণ করেছে, তার সাথে সৎ আচরণ করো। (মুসনাদে আহমদ ৪/১৪৮, হা. ১৭৩৩৪, কানযুল উম্মাল ৩/৩৫৯, হা. ৬৯২৯)

রাসূল (সা.)-কে খুলুকে আজীম দান করা হয়েছে, যা উল্লিখিত তিন বস্তুর সমষ্টি।

তারিখে ইসলাম কিতাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ইহুদী থেকে নবীজি (সা.) কিছু আহারীয় বস্তু ধার নিয়ে ছিলেন। ইহুদী সময়ের পূর্বেই নবীজির কাছে এসে তা চেয়ে বসল। নবী (সা.) বলেন, এখনো তো ব্যবস্থা হয়নি। ব্যবস্থা হলে দিয়ে দেব।

তখন ইহুদী রেগে গিয়ে বলল, আপনাদের মতো মানুষ কিছু নিলে দিতে চায় না। আর ভক্ষণ করলে পরিশোধ করতে চায় না। পাশেই ছিলেন হযরত উমর (রা.)। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি তার পাওনা পরিশোধ করে দেব। নবীজি (সা.) বললেন, তুমি আবার কিভাবে পরিশোধ করবে। উমর (রা.) বললেন, ঘরে গিয়ে তরবারি এনে তার গর্দান উড়িয়ে দেব। নবীজি (সা.) হযরত উমর (রা.)-এর কথা শুনে রেগে গেলেন এবং বললেন, উমর! ইহুদীর কথায় তো আমার রাগ আসেনি। কিন্তু তোমার কথায় আমার রাগ এসেছে। ইহুদী আমার কাছে কর্জ পাবে, সুতরাং তার ভালো-মন্দ বলার অধিকার আছে। কিন্তু তোমার তো তাকে কিছু বলার অধিকার নেই। সুতরাং তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।

ইহুদী নবীজি (সা.)-এর এহেন মহান চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে বলল, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। তাঁর মহান চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এমন মহান চরিত্রের অধিকারী নবীর ওপর ঈমান না এনে পারি না। তারপর সে ইসলামের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

আজ যদি মুসলিম উম্মাহ নবীজির চরিত্রের অনুসরণ করত তাহলে পরস্পর দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকত না। সমাজে কলহ ও ঝগড়া-বিবাদের অস্তিত্ব থাকত না। বরং চতুর্দিকে শান্তির সুশীতল বাতাস বইত। অমুসলিমরা মুসলমানদের কদমবুচি করত। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিত দলে দলে। যেমনটি হয়েছিল রাসূল (সা.)-এর মহান আদর্শে মুগ্ধ হয়ে।

হাদীস শরীফে এসেছে, আবদে কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মদীনা মুনাওয়ারায় নবীজির দরবারে আসেন, তাদের সরদার ছিলেন, আসাজ্জ নামক এক ব্যক্তি। তাঁরা মদীনা শরীফে পৌঁছে তাড়াতাড়ি করে নবী করীম (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। কিন্তু তাঁদের দলপতি আসাজ্জ তাড়াতাড়ি করলেন না। বরং প্রথমে বাহন জন্তুগুলোকে বাঁধলেন। তারপর ওজু করে নবীজির দরবারে হাজির হলেন। নবীজি (সা.) তাঁকে দেখে বললেন, তোমার মাঝে দুটি গুণ আছে, যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। ১. স্থিরতা ও ২. খুলুকে আজীম। (মুসলিম ১/৩৫, হা. ১১৭)

আকাবিরদের মধ্যেও এরূপ বহু ঘটনা পাওয়া যায়।

ইমাম যাইনুল আবেদীন (রহ.) অনেক বড় আলেম ও ইমাম ছিলেন। তাঁর এক দাসী ছিল। একবার তিনি ওজু করছিলেন, আর তাঁর দাসী মাটির লোটা দিয়ে পানি ঢালছিল। হঠাৎ লোটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে ইমাম সাহেবের কাপড় ভিজে গেল। ইমাম সাহেব রেগে গেলেন। তখন দাসী পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত কররেন।

والكاظمين الغيظ অর্থাৎ যারা রাগ সংবরণ করে। তখন ইমাম সাহেব বললেন–ঠিক আছে, আমি রাগ সংবরণ করলাম। অবস্থা বুঝে দাসী পরের আয়াতটি পাঠ করল। والعافين عن الناس অর্থাৎ যারা মানুষকে ক্ষমা করে। তখন ইমাম সাহেব বললেন, ঠিক আছে, ক্ষমা করে দিলাম। এরপর দাসী দেখল অবস্থা তো খুব ভালো। তখন পাঠ করলেন والله يحب المحسنين অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন। তখন ইমাম সাহেব বললেন, আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ।

এটা হলো খুলুকে আযীমের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'আলা খুলুকে আযীম দান করেছেন নবী (সা.)-কে। রাসূল (সা.) বাস্তব আদর্শের মাধ্যমে তাঁর উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন।

আরেকটি ঘটনা :

তায়েফের একটি কাফেলা নবীজি (সা.)-এর দরবারে এলেন। তাদের দেখে নবীজি (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তাদের জন্য চাদর বিছিয়ে দাও। আগন্তুকগণ বলল, আপনি হয়তো তায়েফের ঘটনা ভুলে গেছেন। আমরা হলাম ওই সমস্ত লোক, যারা পাথর মেরে আপনাকে রক্তাক্ত করেছিল। আপনার পেছনে দুষ্ট বালকদের লেলিয়ে দিয়েছিল। নবীজি (সা.) বললেন, এটা তো তায়েফ নয়। এটা তো মদীনা শরীফ। নবীজি (সা.)-এর এই মনোমুগ্ধকর বাণী শ্রবণে তাঁরা ইসলামের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এটাই হচ্ছে খুলুকে আযীম। রাসূল (সা.)-এর উত্তম চরিত্র ছিল বিশ্বজয়ের বড় হাতিয়ার। এই আখলাকে আযীমের বাস্তব আদর্শ রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতের জন্য রেখে গেছেন। মুসলমানগণ যদি এখনও রাসূল (সা.)-এর উত্তম আদর্শ গ্রহণ করে, তবে দুনিয়া তাদের পদানত হবে। অশান্তি দূর হবে। পরস্পর মমত্ববোধ জাগ্রত হবে। আত্মীয়তা ও ধর্মীয় বন্ধন সুদৃঢ় হবে। অশান্তির যত উপকরণ সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদ ও অনুলিখন
মুহাম্মদ মিযানুর রহমান রাশেদী

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৪

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে দেশীয় মুদ্রার হাত বদলে ক্রেতা-বিক্রেতা নিজ নিজ পাওনার ওপর কবজ করা বিষয়ক মাসআলা :

এই মাসআলা নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ, যা মুফতি রশিদ আহমদ (রহ.) বয়ান করেছেন। যার সারমর্ম হলো এই যে পূর্বে আমরা সবিস্তারে উল্লেখ করেছি যে পয়সা বা ব্যাংক নোটের হাত বদল ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে হলে তা বাঈ সরফ নয়। তাই উক্ত হাত বদলে ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য স্ব-স্ব পাওনার ওপর তৎক্ষণাৎ কবজ করা শর্ত না হওয়া চায়। কেননা এটি বাঈ সরফের বৈশিষ্ট্য। বিচারপতি মুফতী তকী উসমানী সাহেবও প্রথমে দেশীয় মুদ্রার হাত বদলে ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য স্ব-স্ব পাওনার ওপর তাৎক্ষণিক কবজ করা শর্ত না হওয়ার মত ব্যক্ত করেছিলেন। এবং তাঁর মতেও উক্ত লেনদেনে একপক্ষ থেকে কবজ পাওয়া গেলে যথেষ্ট হবে, উভয় পক্ষ থেকে কবজ জরুরি নয়। কিন্তু তিনি মুফতী রশীদ আহমদ (রহ.)-এর মত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাঁর পূর্বের মত পরিহার করেন। এবং তিনিও দেশীয় মুদ্রার হাত বদলে উভয় পক্ষের জন্য কবজ জরুরি হওয়ার মত প্রদান করেন। নিম্নে উভয়ের বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো।

মুফতী রশিদ আহমদ সাহেব (রহ.) লিখেন–

'بیع الفلوس بالفلوس بالتساوی' اس میں بالاتفاق تقابض فی المجلس شرط ہے مذہب شیخین رحمہما اللہ تعالی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف تعیین البدلین بلا تقابض بھی کافی ہے یعنی تعیین وتقابض میں کسی کا وجود شرط ہے

قال الامام الكاسانى رحمه الله تعالى تبايعا فلسا بعينه بفلس بعينه فالفلسان لا يتعينان وان عينا الا ان القبض فى المجلس شرط حتى يبطل بترك التقابض فى المجلس لكونه افتراقا عن دين بدين ولو قبض احد البدلين فى المجلس فافترقا قبل قبض الاخر وذكر الكرخى انه لا يبطل العقد لان اشتراط القبض من الجانبين من خصائص الصرف وهذا ليس بصرف فيكتفى فى القبض من احد الجانبين لان به يخرجه به عن كونه افتراقا عن دين بدين وذكر فى بعض شروح مختصر الطحاوى رحمه الله تعالى انه يبطل لالكونه صرف بل لتمكن رباء النساء فيه لوجود احد وصفى علة ربا الفضل وهو الجنس وهو الصحيح (بدائع الصنائع ٢٣٧/٥) وقال الامام الطحاوى رحمه الله تعالى ولا بد من التعيين فى بيع الفلوس بمثلها لاتحاد الجنس كما مر فى بيع الفلس بالفلسين (حاشية الطحطاوى على الدر ١١٠/٣)

مذکورہ نصوص مذہب دیگر بے شمار تصریحات ائمہ فقہ رحمہم اللہ تعالی کے مطابق بیع بالجنس میں ایک جانب کا عدم تعیین ہی نساء ہے جو حرام ہے حرمت تفاضل وجواز نساء کی کوئی نظیر نہیں ملتی بلکہ یہ نصوص فقہ کے سراسر خلاف ہے،(احسن الفتاوی جلد ۷ ص ۸۷)

বিচারপতি মুফতী তকী উসমানী (দা. বা.) লিখেন–

حضرت مولانا مفتی رشید احمد مدظلہم نے احسن الفتاوی جلد ۷ ص ۸۷ پر اس مسئلے پر جو بحث فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں صحت عقد کے لئے احد البدلین پر قبضہ کافی نہیں بلکہ جانبین سے تقابض ضروری ہے حضرت مدظلہم کی دلائل پر غور کرنے کے بعد احقر بھی حضرت کی بات کو راجح سمجھتا ہے واقعہ یہ ہے کہ 'بیع الفلوس بالتساوی' کی صورت میں فقہائے حنفیہ کی تصریحات میں اختلاف ہے، میں پہلے جو حکم لکھا تھا وہ تنویر الابصار، الدر المختار اور علامہ شامی کے تحقیق کے مطابق لکھا تھا اور حضرت مفتی صاحب مدظلہم کے ارشاد کا مبنی بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی رح کی عبارت ہے (یہ عبارت اوپر ذکر ہوئی)اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جانبین سے قبضہ ضروری ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ بیع صرف ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ جنس ایک ہونے کی بناء پر اس میں نسئیہ جائز نہیں، اگر چہ جن حضرات نے احد البدلین پر قبضے کو کافی سمجھا ہے انہوں نے غالبا 'اجل' کی تعیین کے بغیر قبضے کے صرف مؤخر ہونیکو نسئیہ میں داخل نہیں کیا، علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ تعالی نے فتح القدیر جلد ۵ ص ۲۸۸ میں اسی بناء پر اسکو نسئیہ ماننے سے انکار کیا ہے اور چونکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مذہب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے، اور اگر یہ نقل درست ہے تو اس قول کو بھی باطل تو نہیں کہا جاسکتا، لیکن علامہ کاسانی رح کی دلیل بڑی

وزنی ہے اور وہ یہ کہ نسیئہ سے بچنے کیلئے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو عوضین پر مجلس ہی میں قبضہ ہو جائے یا کم از کم عوض مؤخر کی تعیین کی جائے چونکہ راجح قول کی بنا پر فلوس میں تعیین ممکن نہیں اس لئے قبضہ ہی متعین ہے. یہ دلیل چونکہ نہایت قوی ہے، اس لئے احقر 'بیع الفلوس بالفلوس بالتساوی' کے سلسلے میں اپنے سابقہ فتوے سے رجوع کرتا ہے. البلاغ شمارہ جمادی الأولی ۱۴۲۲ھ

উল্লেখ্য, মুফতী রশীদ আহমদ সাহেব (রহ.) ও বিচারপতি তকী উসমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের উপরোক্ত বক্তব্যের সম্পর্ক হলো পয়সার মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের নিজ নিজ পাওনার ওপর কবজ করা বিষয়ে। কিন্তু ব্যাংক নোট যেহেতু তাদের মতে পয়সার হুকুমে, তাই যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পয়সার ক্ষেত্রে হবে, তা ব্যাংক নোটের হাত বদলের ক্ষেত্রেও হবে। সুতরাং ব্যাংক নোট বা দেশীয় মুদ্রা যখন ক্রয়-বিক্রয় সূত্রে হাত বদল হবে উক্ত লেনদেন বাঈ সরফ না হলেও বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হওয়ার কারণে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য বিনিময়দ্বয়ের ওপর কবজ করা জরুরি হবে।

ঋণ হিসেবে এক দেশের ব্যাংক নোটের আদান-প্রদান

পূর্বের আলোচনায় সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে যে স্বদেশীয় মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে হাত বদলের ক্ষেত্রে প্রধান্য প্রাপ্ত মতানুসারে এক বিনিময়ের ওপর অপরটার অতিরিক্ত/আধিক্য বৈধ নয়। এবং একটা নগদ অপরটা বাকি, তাও বৈধ নয়। কিন্তু কখনো কখনো বাকির প্রয়োজনও পড়ে বিধায় ঋণ পদ্ধতিতে লেনদেন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। এ ক্ষেত্রে বাকি বা বিলম্বে পরিশোধ হারাম নয়। কেননা ঋণ নেওয়া বাকিতে পরিশোধ ছাড়া সম্ভব নয়। তবে এ ক্ষেত্রেও একটা বিনিময়ের তুলনায় অপরটার আধিক্য হারাম। কেননা এই আধিক্যটা এ পর্যায়ে রিবান-নাসীআ তথা বিলম্বজনিত সুদের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রসিদ্ধ হাদীস 'كل قرض جر نفعافهو ربا' এর আলোকে অবৈধ এবং হারাম। উল্লিখিত কারণের ভিত্তিতেই যাদের নিকট ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে দেশীয় মুদ্রার লেনদেন অবৈধ তাদের নিকটও ঋণের পদ্ধতিতে এর লেনদেন বৈধ।

দেশীয় মুদ্রার ঋণ গ্রহণ/ঋণ প্রদানের পদ্ধতি :

উদাহরণস্বরূপ বকরের ব্যক্তি প্রয়োজনে বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। তাই সে আমরের নিকট থেকে এক মাস সময়ের জন্য এক লক্ষ টাকা নিল। উক্ত লেনদেন বৈধ। তবে এক মাস পরে বকর আমরকে এক লক্ষ টাকাই দেবে, এতে এক টাকাও অতিরিক্ত দেওয়া হারাম হবে এবং বড় ধরনের গোনাহ হবে। দেখা যায়, উক্ত লেনদেনের মধ্যে একদিকে নগদ, অপরদিকে বাকি। এই বাকি বৈধ। কেননা উক্ত লেনদেন ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে হয়নি বরং ঋণ দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে।

স্বদেশীয় মুদ্রায় হুন্ডির বিধান

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই মাসাআলাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে স্বদেশীয় মুদ্রার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে হুন্ডি বৈধ হবে না। কেননা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির লেনদেনে উভয় পক্ষের জন্য তৎক্ষণাৎ কবজ করা জরুরি। অথচ হুন্ডির মধ্যে তাৎক্ষণিক কবজ করার কল্পনাও করা যায় না। বরং হুন্ডিতে একপক্ষীয় কবজ পাওয়া যায় মাত্র। তবে ঋণের পদ্ধতিতে তা বৈধ। যথা–বকর, আমর উভয়ে সৌদিপ্রবাসী। বকর আমরকে ৫০০ রিয়াল দিয়ে বলল, এই টাকা আপনাকে ঋণ দিলাম। তবে আপনি ওই টাকা আমার আববাকে বাংলাদেশে পরিশোধ করবেন। উক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওই ৫০০ রিয়াল আমরের ঋণ হয়ে গেল। তাই আমর নিজের প্রয়োজনে ওই টাকা খরচ করতে পারবে এবং এর পরিবর্তে আমর ৫০০ রিয়াল বকরের আববাকে পরিশোধ করতে পারবে। যদি তাতে আমরের কোনো ব্যয় হয় তাহলে তা প্রথা অনুসারে আমর বকরের কাছ থেকে নিতে পারবে। উক্ত পদ্ধতি বৈধ। তবে দেশীয় আইনে এর ওপর কোনো প্রকারের নিষেধাজ্ঞা না থাকতে হবে।

মনি অর্ডারের বিধান।

কোনো ব্যক্তি যখন অন্যত্র টাকা প্রেরণ করে এর একটা পদ্ধতি হলো এই যে, ওই লোক পোস্ট অফিসে গিয়ে একটা মনি অর্ডার ফরম সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট ফিস দেয়। অতঃপর তা পূরণ করে কাঙ্ক্ষিত টাকাসহ উক্ত ফরম পোস্ট মাস্টারকে হস্তান্তর করে। ডাক বিভাগের কর্মকর্তা টাকার অ্যামাউন্ট হিসাবে প্রেরকের নিকট থেকে ফিস উসূল করে এবং ডকুমেন্ট হিসেবে একটা রসিদ দিয়ে থাকে। অতঃপর ডাক বিভাগ তাদের নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতিতে ওই টাকা প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেয়। পৌঁছে দেওয়ার পর এর একটা কপি প্রেরকের নিকট এসে যায়। যা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে প্রেরকের টাকা যথাযথভাবে প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যদি পথিমধ্যে কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে ওই টাকার ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে ডাক বিভাগ এর জন্য দায়বদ্ধ থাকে। মূলত টাকা প্রেরণের সময় ডাক বিভাগ যে রসিদ সরবরাহ করে থাকে তা উক্ত টাকার

জামানতনামা বা গ্যারান্টিপত্র হয়। এই হলো মনি অর্ডারের সারমর্ম।

প্রশ্ন : ডাক বিভাগের নিকট হস্তান্তরকৃত টাকা ইসলামী ফিকহের দৃষ্টিকোণে আমানত না করজ? যদি করজ হয় তাহলে হুবহু ওই টাকা প্রাপকের নিকট পৌঁছানো জরুরি নয়, যা প্রেরক ডাক বিভাগকে হস্তান্তর করেছে। বরং ওই পরিমাণ পৌঁছালে যথেষ্ট হয়ে যাবে। উক্ত পদ্ধতিতে প্রেরক ঋণদাতা হবে। এবং ডাক বিভাগ ঋণগ্রহীতা হবে।

যদি মনি অর্ডার প্রক্রিয়াকে আমানত সাব্যস্ত করা হয় তাহলে প্রেরক হবে ইজারাদার এবং ডাক বিভাগ হবে মজুর। মজুরের হাতে উক্ত টাকা আমানতের হুকুমে হবে। এবং আমানতের মধ্যে "নকদ" মুদ্রা নির্ধারণ করা দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়। তাই যুক্তি হলো ওই টাকা হুবহু যথাযথভাবে প্রাপকের হাতে পৌঁছে যাওয়া। অথচ সবারই জানা যে, উক্ত টাকা হুবহু প্রাপকের নিকট পৌঁছানো হয় না। উক্ত প্রক্রিয়াকে আমানত ধরলে আরো একটা সমস্যা হলো। "মজুর" আমিন হন, এবং এর হাতে যেই টাকা থাকে তা আমানত হয়। তাই যদি আমানতদারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকারের অবহেলা ছাড়া উক্ত টাকা নষ্ট হয় অথবা ক্ষতি হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, এর জরিমানা আমানতদারকে গুনতে হবে না। অথচ মনি অর্ডারের ক্ষেত্রে ডাক বিভাগ উক্ত টাকার জামিনদার। উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে মনি অর্ডারের লেনদেনকে "ইজারা" বলা কঠিন। যদিও উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় সমস্যাটি তেমন জটিল নয়। কেননা ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, মজুর জামিনদার হয়। কিন্তু প্রথম সমস্যাটি যেহেতু জটিলতর, তাই মনি অর্ডারের লেনদেনকে শরীয়তের দৃষ্টিতে ইজারা বলা যাবে না। বরং তা হবে করজ। কিন্তু করজ সাব্যস্ত করলেও দুটি সমস্যা রয়ে যায়। (১) ডাক বিভাগের ওপর যে ফিস গ্রহণ করে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেটাও করজের অংশ হয়। এবং প্রাপককে উক্ত টাকা প্রদানের সময় ফিসের টাকা বাদ দিয়ে প্রদান করা হয়। প্রকারান্তরে তা এমন হয় যে করজ দেওয়া হয় বেশি। পাওয়া হলো কম, যা নাজায়েয এবং হারাম। (২) এই লেনদেনটা 'سفتجه' এর অন্তর্ভুক্ত (এর ব্যাখ্যা সবিস্তারে অত্যাসন্ন) কেননা এতেও পথের ঝুঁকি বিয়োজন হয়। এবং 'سفتجه' প্রসিদ্ধ হাদীস 'كل قرض جر نفعا' এর আলোকে অবৈধ। উক্ত সমস্যার বর্ণনা ইমদাদুল ফাতাওয়াতে যেভাবে এসেছে।

উত্তর : সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি হলো 'الاقراض تقضى بأمثالها', অর্থাৎ করজ পরিশোধ করা হবে প্রদেয় টাকার সমপরিমাণ এবং প্রতিষ্ঠিত বিধান হলো, করজের মধ্যে কমবেশির শর্তারোপ করা সুদ। এখন বুঝতে হবে যে মনি অর্ডারের যেই টাকা ডাক বিভাগকে হস্তান্তর করা হয় সেটা কি আমানত? এবং ডাক কর্তৃপক্ষ প্রেরকের মজুর? নাকি করজ? এবং ডাক বিভাগ করজগ্রহীতা। নিশ্চিতভাবে এ কথা যেহেতু সবারই জানা যে উক্ত টাকা হুবহু প্রাপকের নিকট পাঠানো হয় না। এবং আইন হলো যদি উক্ত টাকা কোনো কারণে ডাক বিভাগ থেকে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ডাক বিভাগ এর জামিনদার। উপরোক্ত বিষয় দুটি দ্বারা বোঝা যায় মনি অর্ডারের টাকা ডাক কর্তৃপক্ষের নিকট আমানত নয়। বরং করজ, যা অন্যত্র আদায় করা হয়ে থাকে তাই এর ওপর প্রদেয় ফিস ও করজের অংশ হলো। এবং প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার সময় যেহেতু ফিস ব্যতীত আদায় করা হয়, সেহেতু করজের মধ্যে কমবেশি করাও সৃষ্টি হয়। তাই এটা নিষিদ্ধ। বরং ফিসের প্রক্রিয়া না থাকলেও পূর্বে উল্লিখিত মূলনীতি 'كل قرض جر نفعا فهو ربا' এর আলোকে পথের ঝুঁকি বিয়োজনের সুবিধা অর্জনের কারণে 'سفتجه' হয়ে তা মাকরূহ হবে (ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ১৪৩)

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান।

১. ডাক বিভাগ মনি অর্ডারের ওপর যেই ফিস গ্রহণ করে তা করজের অংশ নয় বরং সার্ভিস চার্জ (Service Charges) হিসেবে। অর্থাৎ, রেজিস্টারে লেখা রসিদ দেওয়া এবং ফরম পাঠানোর চার্জ হিসেবে গ্রহণ করে।

২. উক্ত সমস্যার দুটি সমাধান হতে পারে–

(ক) উক্ত লেনদেন 'سفتجه' (সুফতাজা) নয়।'سفتجه' হলো পথের ঝুঁকি বিয়োজন, যার ব্যাখ্যা অত্যাসন্ন। অথচ মনি অর্ডারের উদ্দেশ্য তা নয় বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো টাকা প্রেরণ, যার ওপর ফিস/মাসুল নেওয়া বৈধ। আহসানুল ফাতাওয়াতে তা এভাবে উল্লেখ রয়েছে যে আমার মতে, করজ দ্বারা যখন পথের ঝুঁকি বিয়োজন উদ্দেশ্য হয় না। বরং অন্যত্র টাকা পাঠানোই শুধুমাত্র উদ্দেশ্য হয়। তাহলে সেটা মাকরূহ সুফতাজাহর অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদিও এতে টাকা প্রেরণের সাথে সাথে পথের ঝুঁকি বিয়োজন অনিবার্যভাবে হয়ে যায়। তবে মূল উদ্দেশ্য এবং অনিবার্যবশত হয়ে যাওয়া উভয়টার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যথা–স্থানীয় পর্যায়ের ঋণের মধ্যে ও মালের হেফাজতের সুবিধা অনিবার্যবশত হয়ে যায় তা সত্ত্বেও এটাকে 'كل قرض جر نفعا فهو ربا' এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম সাব্যস্ত করা হয় না। তিনি বলেন,

আমার উপরোক্ত মতামতের সহায়ক হয় শরহেবেকায়া গ্রন্থের টিকা তাকমালায়ে উমদাতুররিআতে "হাওয়ালা" অধ্যায়ে মাও. ফতেহ মুহাম্মদ তায়েব (রহ.)-এর গবেষণা দ্বারাও। তিনি এ ক্ষেত্রে মনি অর্ডার ও হুন্ডির অন্য প্রকারসমূহের ব্যাখ্যা এবং এর শরয়ী বিধান বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেন–

ويجب أن يعلم أن التى فى زماننا المسماة فى لساننا (بهندى منى ارڈر)ليس من هذا ولا له حكم حكم السفاتج . لأن السفاتج كانت لسقوط خطر الطريق وذا للأصول فان قلت علة الكراهة هى النفع سواء كان لسقوط خطر الطريق أو للوصول قلت بلى ولكن الخطر مما لا يجوز الكفالة به ولا أجر عليه لأنه ليس فى وسع الانسان الا دفع اللصوص والحفظ انما بفضل الله تعالى وأما الايصال تحل الأجرة عليه ويمكن العهدة عليه فلا يلزم من النهى عن نفع سقوط الخطر كراهة أجرة الايصال (احسن الفتاوى٧/١٠٧–١٠٨)

উল্লিখিত বক্তব্যের সারমর্ম হলো ওই, যা মুফতী রশীদ আহমদ সাহেব (রহ.) উল্লেখ করেছেন তবে এখানে একটি প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন এবং এর উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন এবং উত্তরের সারসংক্ষেপ হলো, উদ্দেশ্য পথের ঝুঁকি বিয়োজন হোক বা টাকা পৌঁছানো হোক। উভয় ক্ষেত্রে করজদাতার লাভ হচ্ছে, যা পূর্বে বর্ণিত হাদীসের আলোকে নিষিদ্ধ। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে পথের ঝুঁকি বিয়োজনের অর্থ হলো, জামিনদার হওয়া। অথচ এর জামিনদার হওয়া নাজায়েয। কেননা পথের ঝুঁকি বিয়োজন নিজের ইখতিয়ারাধীন কোনো বিষয় নয়। দ্বিতীয় কথা হলো, জামিনদার হওয়ার ওপর কোনো প্রকারের চার্জ বা ফিস নেওয়া যায় না। পক্ষান্তরে টাকা পৌঁছানো, এর জামিনদার হওয়াও বৈধ। কেননা এটা ইখতিয়ারাধীন বিষয় এবং এর ওপর ফিস গ্রহণ করাও বৈধ। তাই পথের ঝুঁকি বিয়োজন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে টাকা পৌঁছানো নিষেধ হওয়া অপরিহার্য নয়।

(খ) যদি মনি অর্ডার প্রক্রিয়াকে সুফতাজাহর অন্তর্ভুক্তও করা যায়। তাহলে সমস্যার ব্যাপকতাও অতীব প্রয়োজনের মূলনীতি অনুসারে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য মতানুসারে ফাতাওয়া দেওয়া যাবে। কেননা ফিকহবিদদের মধ্যে অনেকে "সুফতাজাহ" জায়েয বলে মত দিয়েছেন। যা ব্যাখ্যা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ইমদাদুল ফাতাওয়ায় উল্লেখ রয়েছে যে এমনকি যদি এটাও নির্ভরযোগ্য সূত্রে নিশ্চিত হওয়া যায় ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনো একজনও "সুফতাজাহ" বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন, তখনো জরুরতের ভিত্তিতে এর ওপর আমল করাকে জায়েয বলা যাবে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ১৪৫)

আহসানুল ফাতাওয়ায় উল্লেখ রয়েছে যে উক্ত প্রক্রিয়াকে সুফতাজাও যদি মেনে নেওয়া হয় ইমাম আহমদ (রহ.)-এর নিকট এ ক্ষেত্রে "সুফতাজাহ" বৈধ। সমস্যার ব্যাপকতা এবং অতীব প্রয়োজনে মূলনীতির ভিত্তিতে অন্য ইমামের মাযহাবের ওপর আমল করা জায়েয। (আহসানুল ফাতাওয়া, খ. ৭, পৃ. ১০৯)

সারসংক্ষেপ, মনি অর্ডারের লেনদেন বৈধ এবং এর মাধ্যমে টাকা পাঠানো বৈধ। ডাক বিভাগ এর ওপর ফিস গ্রহণ করাও বৈধ। এই বিধান ব্যাংক ড্রাফটের ক্ষেত্রেও একই।

سفتجه (সুফতাজাহ)-এর শাব্দিক অর্থ মূলত এই শব্দটি ফারসী শব্দ سفته শব্দ থেকে আরবী বানানো হয়েছে। উভয়টার অর্থ সুদৃঢ়করণ।

শরীয়তের পরিভাষায় এটা একটি আর্থিক লেনদেন, যাতে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো স্থানে এই মর্মে করজ প্রদান করে যে এই ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধি করজদাতা বা তার প্রতিনিধিকে অন্য একটা শহরে বা স্থানে তা পরিশোধ করবে। এর বহুবচন سفاتج (সফাতিজুন)

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণে সুফতাজাহ এবং এর ফিকহী রূপ

ইসলামী ফিকাহ বিশারদগণ সুফতাজাহর বর্ণনা দুটি অধ্যায়ে সাধারণত বর্ণনা করে থাকেন। প্রথমত, করজ/ঋণ অধ্যায়। দ্বিতীয়ত, হাওয়ালা অধ্যায়।

মূলত এ বিষয়ে ফুকহায়ে কেরামের তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। (১) জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে এটি করজ/ঋণের মুআমালা (২) কারো মতে এটা হাওয়ালা (৩) অন্য কারো মতে ইজারা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটি করজেরই মুআমালা যেমনটা স্পষ্ট এবং জমহুর উলামায়ে কেরাম এটাকেই ইখতিয়ার করেছেন।

"সুফতাজাহর" শরয়ী বিধান।

এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। উলামায়ে কেরামের একপক্ষ এটিকে মাকরূহ এবং নাজায়েয বলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাবেঈদের মধ্যে ইমাম ইবনে সিরীন, ইমাম কাতাদাহ, ইমাম শা'বী এবং ইমাম ইব্রাহীম নাখঈ, ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং কোনো কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুসারে ইমাম মালেক (রহ.)ও। দ্বিতীয়পক্ষের মতানুসারে এটা বৈধ ও জায়েয। এই

পক্ষে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনুয্যুবাইর, আলী, হাসান ইবনে আলী (রা.) এবং তাবেঈদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ, আইয়ূব, ইমাম ছাওরী, ইমাম ইসহাক এবং ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তদ্রূপ অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মধ্যে আল্লামা ইবনে কুদামা, আবু ইয়া'লা ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমপক্ষের দলিলসমূহের সারাংশ

১. "সুফতাজাহ" দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে পথের ঝুঁকি বিয়োজন, এটা এক ধরনের সুবিধা, যা করজদাতার অর্জিত হয় ঋণ প্রদানের মাধ্যমে। পবিত্র হাদীসসমূহে যার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যথা–প্রসিদ্ধ হাদীস 'كل قرض جر نفعافهو ربا' অর্থাৎ ওই সব ঋণ, যাতে কোনো না কোনো প্রকারের এবং কোনো না কোনোভাবে সুবিধা অর্জিত হবে, তা সুদ। (বিস্তারিত ব্যাখ্যা পূর্বের আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে।)

২. সাহাবায়ে কেরামের (রহ.) ওই সব করজ/ঋণকে অপছন্দ করতেন, যার কারণে কোনো প্রকারের সুবিধা/মুনাফা অর্জিত হয়। যথা–

عن عطاء قال كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة (مصنف ابن ابى شيبه ١٨٠/٦)

অর্থাৎ হযরত আতা (রহ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম ওই সব করজ/ঋণকে মাকরূহ মনে করতেন যার দ্বারা কোনো মুনাফা অর্জিত হয়।

৩. করজের আকদ/ঋণের চুক্তি উপকার এবং তাবাররু এর ওপর ভিত্তি। তাই যখন এর মধ্যে "সুফতাজাহর" শর্তারোপ করা হবে, তখন সেটা আর উপকার এবং তাবাররু থাকবে না। সুতরাং এটা বৈধ নয়।

যেসব কারণে "সুফতাজাহ" নিষিদ্ধ।

এ ক্ষেত্রে মূলত তিনটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. মুনাফা/সুবিধা অর্জন–এ কারণটা সুপ্রসিদ্ধ।

২. করজের কষ্ট থেকে পরিত্রাণ বা রেহাই পাওয়া। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরাম সুফতাজাহকে এ জন্য মাকরূহ বলেছেন যে করজ হিসেবে প্রদেয় বস্তু যদি বহনে কষ্ট হয় এবং সেটা এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর কষ্টসাধ্য হয় ওই ধরনের কোনো বস্তু সুফতাজাহর শর্তের ভিত্তিতে কাউকে করজ দেওয়া অবৈধ। উপরোক্ত কারণ পাওয়া না গেলে সুফতাজাহ বৈধ। (আল কাফী, খ. ২, পৃ. ১২৫)

৩. হযরত ইমাম মালেক (রহ.) থেকে এ কারণটাও উদ্ধৃত আছে যে, 'মূল্যের ব্যবধান' অর্থাৎ সাধারণত যেই শহরে তা পরিশোধের শর্তারোপ করা হয় ওই শহরের মূল্য ভিন্নতর হয়, যার ফলে করজের মধ্যে অনিবার্যবশত কমবেশি হয়ে যায়, যা অবৈধ। (আহকামুল আওরাকিন নাকদিয়াহ লিল জাইদ, পৃ. ৩৪১)

ব্যতিক্রম (Exception)

যাদের নিকট সুফতাজাহ নাজায়েজ এবং মাকরূহ তাদের নিকট উক্ত বিধান থেকে দুটি পদ্ধতি ব্যতিক্রম।

১. করজের মুআমালা আগে হওয়া এবং সুফতাজাহ পরে হওয়া। এটা বৈধ। কেননা এতে করজের সাথে মুনাফা অর্জনের শর্ত পাওয়া যায়নি বরং এটা শুধুমাত্র উপকার এবং তাবাররু এবং উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা এ কথা বলা হয়েছে যে এখানে মুনাফা দ্বারা ওই মুনাফাই উদ্দেশ্য, যা শর্ত সাপেক্ষে হবে বা প্রথা অনুসারে হবে। যদি কোনো শর্ত এবং প্রথা অনুসারে মুনাফা অর্জিত না হয় বরং সাধারণভাবে হয় তাহলে সেটাকে কেবলমাত্র উপকার এবং তাবাররু মনে করা হবে। এ পক্ষের উলামায়ে কেরাম হযরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে উদ্ধৃত "সুফতাজাহ" বৈধ হওয়ার ব্যাখ্যা এভাবে করে থাকেন (ফাতাওয়া আলমগীরি, খ. ৩, পৃ. ২৯৪)

২. যেখানে সচরাচর নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করবে, সেখানে সুফতাজাহ বৈধ। (আল খারশী, খ. ৫, পৃ. ২৩১) বর্তমানে আমাদের দেশের অবস্থাও তাই। সুতরাং প্রয়োজনের খাতিরে মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাব মতে আমলের অবকাশ রয়েছে। যেমনটা মনি অর্ডারের আলোচনায় সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়পক্ষের দলিলসমূহ :

১. কিছুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম, যথা হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে উমর (রা.) প্রমুখ "সুফতাজাহ" বা এর সাদৃশ্য পদ্ধতিগুলোকে জায়েয বলতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক খ. ৮, পৃ. ১৪০)

২. অনেক তাবেঈ, যথা আল্লামা ইবনে সীরীন প্রমুখ "সুফতাজাহ" বা তার সাদৃশ্যকে বৈধ বলতেন। আল মুগনী আহকামুন নাকদীয়া লিল জাইদ, পৃ. ৩৪৩ সূত্রে)

৩. "সুফতাজাহ" বৈধ হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল এটা পেশ করা হয় যে এতে মুনাফা উভয়ের অর্জিত হয়। অর্থাৎ মুনাফা শুধুমাত্র ঋণদাতার অর্জিত হয় তা না, বরং ঋণগ্রহীতারও অর্জিত হয়। যথা–ঋণগ্রহীতা নিজের শহরে যেখানে তার মাল রয়েছে, সেখানে পরিশোধ করে। সুতরাং এরও তো পথের ঝুঁকি বিয়োজনের সুবিধা অর্জিত হয়, যেমনটা ঋণদাতার হয়ে থাকে। সুতরাং মুনাফা সুবিধা উভয় পক্ষের অর্জিত হওয়াটা বাস্তব, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়।

আল্লামা ইবনে কুদামাহ (রহ.) বলেন–

والصحيح جوازه لانه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لايرد بتحريم المصالح التى لا مضرة فيها بل بمشروعيتها ولان هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا فى معنى المنصوص فوجب ابقاء على الاباحة۔

অর্থাৎ "সুফতাজাহ" বৈধ হওয়াটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা এতে ঋণদাতা এবং গ্রহীতা উভয় পক্ষের স্বার্থ থাকে এবং কোনো পক্ষের ক্ষতি হয় না। ইসলামী শরীয়ত ওই স্বার্থকে হারাম সাব্যস্ত করেনি, যাতে কোনো প্রকারের ক্ষতি নিহিত না থাকে। বরং ওই ধরনের স্বার্থের অনুমোদন দিয়েছে এবং এ কারণেও "সুফতাজাহ" বৈধ। যে সুফতাজাহ হারাম হওয়ার ওপর কোনো প্রতিষ্ঠিত নস নেই বা নসের সমার্থক কোনো রায়ও নেই। তাই এটাকে বৈধতার ওপর বহাল রাখা ওয়াজিব। (আল মুগনী আহকামুল আওরাকিন্নাকদিয়্যাহ, পৃ. ৩৪২ সূত্রে)

একই বক্তব্য আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.)-এরও। তিনি লিখেন–

ولكن قديكون فى القرض منفعة للمقرض كما فى مسئلة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها والصحيح انها لا تكره لان المقترض ينتفع بها ايضا ففيها منفعة لهما جميعا۔

অর্থাৎ কখনো ঋণদাতার মুনাফা অর্জিত হয় ঋণের মাধ্যমে। যথা–"সুফতাজাহ" এ কারণে অনেকে সুফতাজহকে মাকরূহ বলেছেন। অথচ বিশুদ্ধ মত হলো এই যে সুফতাজাহ মাকরূহ নয়। কেননা এতে ঋণগ্রহীতার মুনাফা/সুবিধা আছে। বরং এতে উভয়ের জন্য মুনাফা নিহিত রয়েছে। (মাজমুয়া ফাতাওয়া, খ. ২০, পৃ. ৫১৫)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন–

وروى عنه (احمد) الجواز نقله ابن المنذر لانه مصلحة لهما فلم ينفرد المقرض والمنفعة التى تجرالى الربا فى القرض هى التى تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فانه لا مصلحة له فى ذلك بخلاف هذه المسائل فان المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهى من جنس التعاون والمشاركة۔ (شرح الحافظ ابن القيم على سنن ابى داود مع عون المعبود)

অর্থাৎ ইমাম আহমদ থেকে "সুফতাজাহ" বৈধ হওয়াটা বর্ণিত। যা আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) উল্লেখ করেছেন। কেননা এতে উভয় পক্ষের স্বার্থ নিহিত রয়েছে। শুধুমাত্র ঋণদাতার স্বার্থ নয়। ঋণের মধ্যে যেই মুনাফা সুদের কারণ, তা ওই মুনাফা, যা বিশেষভাবে ঋণদাতার জন্য হয়ে থাকে। যথা–ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার ঘরে বসবাস করা তার বাহনে আরোহন করা। নিজের কাজে তার বাহন ব্যবহার করা। এর কাছ থেকে হাদিয়া নেওয়া ইত্যাদি। যাতে ঋণগ্রহীতার কোনো লাভ বা স্বার্থ নেই। বরং লাভও স্বার্থ কেবল ঋণদাতার। কিন্তু এসব মাসআলায় তো যৌথ মুনাফা। সুতরাং এটা পরস্পর সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হবে।

ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত মতামত ও বক্তব্যের মর্মার্থ হলো তাদের মতে 'كل قرض جر نفعافهو ربا' দ্বারা ওই সব মুনাফা/সুবিধা উদ্দেশ্য, যা বিশেষভাবে ঋণদাতার জন্য অর্জিত হয়। তবে মুনাফা যদি উভয়ের জন্য অর্জিত হয় তাহলে ওই পদ্ধতি উক্ত হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না।

উপরোক্ত বক্তব্যের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

কিন্তু উপরোক্ত বক্তব্য বর্ণিত হাদীসের সচরাচর অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি ওই মতামতকে বিশুদ্ধ ধরে নেওয়া হয় তাহলে এর চাহিদা হবে এই, যদি কোনো ব্যবসায়ী কারো কাছ থেকে ঋণ নিল এবং এর ওপর কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার শর্তও থাকল এই পদ্ধতিটা বৈধ হওয়া। কেননা এতেও উভয় পক্ষের লাভ। ঋণদাতার লাভ হলো এই যে ওই ব্যক্তি নিজের মালের ওপর কিছু অতিরিক্ত অর্জন করল এবং ব্যবসায়ীর লাভ হলো এই যে সে ওই টাকাগুলো ব্যবসার মধ্যে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করল। অথচ এটা একটা মারাত্মক কথা। কেননা এর ভিত্তিতে বর্তমান যুগে সর্বপ্রকারের উন্নয়নমূলক বাণিজ্যিক ও কৃষিঋণের ওপর সুদ নেওয়া বৈধ হয়ে যাবে। যেমনটা কিছু কিছু প্রগতিবাদীর ধারণা। তাই উপরোক্ত ব্যাখ্যা নিতান্ত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য।

সাহাবায়ে কেরাম (রহ.) এবং তাবেঈদের থেকে "সুফতাজাহ" জায়েয হওয়ার ব্যাপারে যা কিছু বর্ণিত রয়েছে প্রথমত, এর দ্বারা এই "সুফতাজাহই" উদ্দেশ্য হওয়া জরুরি নয়। দ্বিতীয়ত, এই সুফতাজাহও যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে শর্তহীন এবং সাধারণ নিরাপত্তাহীনতার অজুহাতে। সুতরাং ওই সব বক্তব্য দ্বারা বর্তমান প্রচলিত সুফতাজাহ বৈধ হওয়ার ওপর দলিল দেওয়া তেমন নির্ভরযোগ্য হবে না। সারসংক্ষেপ, এ বিষয়ে প্রধান্য প্রাপ্ত মত হলো এই যে সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় "সুফতাজাহ" মাকরূহ এবং নাজায়েয, তবে "সুফতাজাহ" যদি শর্ত সাপেক্ষে বা প্রথা অনুসারে না হয় অথবা নিতান্ত অপারগ হয় তাহলে এর অবকাশ থাকতে পারে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

কোরআন-সুন্নাহর আলোকে উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

মাওলানা কাসেম শরিফ

মানবতার প্রতি নবুওয়াতের প্রথম উপহার হলো 'ইকরা'। অর্থাৎ 'তুমি পড়ো'। তৎকালীন আরবরা দীর্ঘদিন যাবৎ ইলমে ওহীর পরশ ও নবী-রাসূলদের সংস্পর্শ বঞ্চিত হয়ে নিমজ্জিত ছিল অজ্ঞতা, মূর্খতা, বর্বরতা, অন্ধকার ও কুসংস্কারে । গোটা বিশ্বের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সুশিক্ষার অভাবে তারা ভালো-মন্দের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। ব্যভিচার, অনাচার, অত্যচার ও পাপাচারের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে তাতেই তারা জীবনের সার্থকতা খুঁজে নিয়েছিল। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষও ছিল হাতে গোনা কয়েক জন। এমনি প্রেক্ষাপটে রাসূল (সা.) আগমন করেছিলেন শিক্ষক হিসেবে। এসেছেন আদর্শ শিক্ষার সুমহান মিশন নিয়ে। কোরআনের ভাষায় শুনুন :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

'আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে তাদের মাঝে তাদের মধ্য থেকেই নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদের পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪)।

মাত্র তেইশ বছরের সফল মিশনে তিনি যে শিক্ষা বিপ্লব ঘটিয়েছেন, ইতিহাস তার দৃষ্টান্ত দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ মহান শিক্ষক শিক্ষার সমূহ উপকরণও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। শিক্ষার অন্যতম উপকরণ হলো কলম। আল্লাহ বলেন,

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤)

'পড়ো' তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞানদান করেছেন।' (সূরা আলাক : ৩,৪)

পবিত্র কোরআনে একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আল-কলম' নামে। শিক্ষার আরেকটি অন্যতম উপকরণ হলো, গ্রন্থ পুস্তিকা ও বই। বই শব্দের আরবী 'কিতাব'। সে মহান শিক্ষক পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম কিতাবও নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ বলেন,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

'এটা সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহভীরুদের জন্য এটি পথনির্দেশ'। (সূরা বাকারা : ২) বলা হয়ে থাকে, সভ্যতার প্রধান উপাদান হলো শিক্ষা। যে জাতি যতটা শিক্ষিত, সে জাতি ততটা উন্নত। কোনো জাতিসত্তা ও সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক হজরত মুহাম্মদ (সা.) তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তৎকালীন পশ্চাৎপদ, অনগ্রসর, বর্বর আরব জাতিকে তিনি সুশিক্ষিত করে বিশ্ববাসীর জন্য মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা বিপ্লব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পথে-প্রান্তরে, দেশ-দেশান্তরে ও যুগ থেকে যুগান্তরে। তাঁর শিক্ষা কেবলই কালজয়ী ছিল না; ছিল কালোত্তীর্ণ। কালের আবর্তনে, দিবসের ঘূর্ণনে, সময়ের পরিবর্তনে ঐশ্বরিক সেতুবন্ধনের সূত্র ধরে উলামায়ে কেরাম সে মহান শিক্ষার যোগ্য উত্তরাধিকারী। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলমান যারপরনাই নির্যাতন, নিপীড়ন ও আগ্রাসনের শিকার। অন্য কোনো ধর্ম ও ধর্মাবলম্বী অতীতেও এতটা মজলুম হয়নি; বর্তমানেও নয়। আশ্চর্য, তবুও বলা হয়ে থাকে, 'বিশ্বে ইসলামই দ্রুত সম্প্রসারণশীল ধর্ম।' অস্বীকার করার উপায় নেই, এর পেছনে রয়েছে উলামায়ে কেরামের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা।

কোরআনের বর্ণনায় উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন

বিশৃঙ্খল, অপরাধপ্রবণ ও বহুধাবিভক্ত জাতিগোষ্ঠীর মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে শান্তির পতাকা উড্ডীন করার জন্য পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আইনের চোখে সমতা, পক্ষপাতহীন বিচারব্যবস্থা ও বিশ্বমানবতার ইতিহাসের নির্মোহ বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ধারা কোরআনই প্রথম সৃষ্টি করেছে। তাই ইহুদী খ্রিস্টান-মুশরিক ও মুসলিমদের সবাইকে এক কাতারে দাঁড় করানো হয়নি। খ্রিস্টান থাকা অবস্থায় আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসীর আতিথেয়তা, সহযোগিতাও হৃদয়ের কোমলতার কথা কোরআন অত্যন্ত মোহনীয় ও আবেদনময়ী ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছে। ইহুদী-খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা ভালো মন ও মানের মানুষ ছিল, কোরআন তাদেরও স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। মূলত নির্মোহ মূল্যায়নের জন্য যে জ্ঞানের পরিপক্কতা ও পূর্ণতা দরকার, তা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই আয়ত্তে নেই।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

'তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে, এর সবই তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের

কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।' (সূরা : বাকারা, আয়াত : ২৫৫)। অন্যত্র তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

'অদৃশ্যের কুঞ্জিসমূ তাঁরই নিকট রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু রয়েছে, তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অংকুরিত হয় না, রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই। যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) সুরক্ষিত নয়।' (সূরা : আনআম, আয়াত : ৫৯)। তা ছাড়া মতান্ধ, দলান্ধ, আদর্শের সংকুচিত গণ্ডিভুক্ত স্বার্থন্বেষী মহলের ইতিহাসচর্চার বিপরীতে পার্থিবতার সব উপাদান ও স্বার্থমুক্ত সত্তাই পারে কারো যথার্থ মূল্যায়ন করতে। কোনো বক্রতা ছাড়াই বলা হয়েছে,

اللَّهُ الصَّمَدُ

'আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন'। (সূরা : ইখলাছ, আয়াত : ২) তাই কোরআন যাদের নিয়ে যে মূল্যায়ন করেছে, তার যথার্থতা, সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা প্রশ্নাতীত। একই কথা আলেম সমাজ নিয়ে কোরআনের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও।

উত্তম-অধমের দ্বন্দ্ব বনাম কোরআনের মীমাংসা

'কে উত্তম, কে অধম'-এ প্রশ্নের অবতারণা ঘটেছে প্রতিটি যুগে, প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে। একসময় যাদের সুসভ্য, উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত ও সর্বোত্তম জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাদের পতনে কিংবা পরিস্থিতির পরিবর্তনে কালক্রমে তারাই অধঃপতিত অধম জাতিতে পরিণত হয়। মানুষ নতুন কাউকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করে। দুটি বিষয়ে পৃথিবীর সর্বাধিক মানুষের ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। এক, মানুষ শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। দুই, খালেক ও স্রষ্টার অস্তিত্ব। আর এ দুটি ঘোষণাও এসেছে কোরআনের কাছ থেকে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

'আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদের উত্তম রিজিক দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০)

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

"যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। (সূরা : আনকাবুত : ৬১)। কোরআনের মানব মর্যাদার থিওরি ও ধারণাকে আজ পর্যন্ত কেউ উপেক্ষা করতে পারেনি; উল্টো কাফিররাও তারই সম্পর্কে বহু প্রমাণ উপস্থাপন করেছে!! কোরআন সে মানব মর্যাদার ধারণাকে আরেকটু আগ বাড়িয়ে তাকে শ্রেণি বিভাগে বিন্যস্ত করেছে। ঘোষণা করেছে,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

'আল্লাহ (সমগ্র মানবজাতির মধ্যে) ঈমানদারদের এবং (ঈমানদারদের মধ্যে) যাদের ইলম দান করা হয়েছে, তাদের অধিক মর্যাদায় উন্নীত করবেন।' (সূরা : মুজাদালা, আয়াত : ১১)। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'অন্য মুমিনদের মধ্যে আলেমের মর্যাদা শত স্তর বেশি হবে। আর দুটি স্তরের মাঝে পাঁচ শত বছরের দূরত্ব থাকবে।' (ইহয়াউল উলূম, খণ্ড : ১) বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে যদি প্রশ্ন করা হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? তাহলে অবশ্যই বলা হবে, শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যকার পশুত্বের অবসান ঘটিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো, মানবতাবোধ জন্মানো ও অবিনশ্বর জীবনের পাথেয় জোগানো; তবে বলতেই হবে, যে জ্ঞান মানুষকে উদরভর্তি করতে শেখায়, জাগতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে, সে জ্ঞান মানবীয় মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

'যারা কুফরী করে, তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় উদরপূর্তি করে। আর জাহান্নামই তাদের নিবাস।' (সূরা মুহাম্মদ : ১২)। অন্যত্র বলা হয়েছে,

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা উদাসীন।' (সূরা রূম : ৭) অন্যদিকে যে জ্ঞান উভয় জগতের কল্যাণের আঁধার, সে জ্ঞানই তো চির কাঙ্ক্ষিত। বলা হয়েছে,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

'হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও' (সূরা বাকারা : ২০১) হজরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, 'এখানে দুনিয়ার কল্যাণ বলতে ইলম ও ইবাদাত উদ্দেশ্য।' অন্যত্র বলা হয়েছে,

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

'হে আমার রব! আমাকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করো।' (সূরা : ত্বাহা, ১১৪)।

কাজেই জ্ঞানীদের মধ্যে চির কল্যাণকর জ্ঞানের অধিকারীদের সঙ্গে অন্যদের তুলনাই চলে না। আর শরীয়তের পরিভাষায় সেসব জ্ঞানীকে 'আলেম-উলামা' বলে অভিহিত করা হয়। তাই মানুষ আর অন্য প্রাণী যেমন

সমান নয়, অন্ধকার ও আঁধার যেমন সমান নয়। জ্ঞান ও অজ্ঞতা যেমন সমান নয়; জাগতিক জ্ঞান ও চির কল্যাণকর জ্ঞান তেমনি সমান নয়। মানুষের মর্যাদা, আলোর উজ্জ্বলতা, জ্ঞানীর প্রাজ্ঞতা যেমন স্পষ্ট, ঠিক তেমনি অন্য বিদ্বান ব্যক্তিরাও আলেমের সমতুল্য হতে পারবে না।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'বলো, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?' (সূরা যুমার : ৯)

আলেমগণ আল্লাহর আদালতের রাজসাক্ষী

পার্থিব জগতে রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক অমীমাংসিত বিষয় মীমাংসার জন্য, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজসাক্ষীদের তলব করা হয়ে থাকে। রাজবন্দিদের জবানবন্দির নির্দেশ জারি করা হয়ে থাকে। আর তাদের সাক্ষ্যকে অভ্রান্ত ও রায়ের চূড়ান্ত নির্দেশনা মনে করা হয়। আল্লাহর আদালতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাওহিদ ও একত্ববাদের প্রশ্নে আলেমগণ হলেন 'রাজসাক্ষী'

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, (এ সাক্ষ্য দেন) ফেরেশতাগণ ও আলেমগণও; আল্লাহ ন্যায় ও ইনসাফে সুপ্রতিষ্ঠিত।' (সূরা : আলে ইমরান : ১৮)

সত্য অনুধাবন ও রহস্য উদ্‌ঘাটনের ক্ষমতা আলেমদেরই রয়েছে

ইলম ও জ্ঞানকে আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে কেননা মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, পাপ-পূণ্যের মাঝে পরখ করার পথ বাতলে দেয়। পবিত্র কোরআন বহু স্থানে এরই নমুনা উপস্থাপন করেছে। আলেম-উলামার সত্য অনুধাবনের ধী-শক্তি ও সক্ষমতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

'আলেমগণ জানেন' তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা-ই সত্য; এটি পরাক্রমশালী প্রশংসিত প্রভুর পথনির্দেশ করে।' (সূরা : সাবা, ৬)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

'এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দিই, কিন্তু কেবল আলেমরাই তা অনুধাবন করে।' (সূরা : আনকাবুত : ৪৩)

আর অদৃশ্যের রহস্যভেদ করে অসীম সত্তার পরিচয় জানতে পেরেছে কেবল আলেম সমাজই। তাই তারা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে উলামারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী। ক্ষমাশীল।' (সূরা : ফাতির : ২৮)

আলেমের শক্তি বিত্তশালীর শক্তিকে অতিক্রম করেছে

সম্পদের সক্ষমতা ও ইলমের শক্তিমত্তার মাঝে কে বেশি শক্তিমান, এ নিয়ে কৌতূহল ও বিতর্ক রয়েছে। সে বিতর্কে কোরআন ইলম ও আলেমের পক্ষ অবলম্বন করেছে।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

"যাদের ইলম দেওয়া হয়েছিল, তারা বলল, 'ধিক তোমাদের' সম্পদের তুলনায় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ'।" (সূরা কাসাস : ৮০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

"কিতাবের ইলম যার ছিল, সে বলল, 'আপনি চোখের পলক খোলার আগেই আমি (ইলমের শক্তিতে রাজসিংহাসন) আপনাকে এনে দেব।' (সূরা : নামল : ৪০)

আলেমগণ সর্বসাধারণের ধর্মীয় অভিভাবক

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই বিশেষ পণ্ডিত, পুরোধা ও অভিভাবক রয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। মর্যাদার চোখে দেখা হয়। আর নবী-রাসূলদের অবর্তমানে আলেমগণ সর্বসাধারণের ধর্মীয় অভিভাবক। ধর্মীয় বিষয়ে তাদের মীমাংসাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো।' (সূরা : আম্বিয়া : ৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

'আর যখনই তাদের কাছে কোনো শান্তি কিংবা ভয়ের সংবাদ পৌঁছে, তখন তারা সেগুলো রটিয়ে দেয়। যদি তারা সেগুলো রাসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের গোচরে আনত। তবে তাদের অনুসন্ধানকারীগণ এর যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।' (সূরা নিসা : ৮৩)। এ আয়াত থেকেও বোঝা যায়, ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার কেবল বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের। আর সর্বসাধারণের উচিত তাদের মান্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

'তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বিশেষ দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য কেন বের হচ্ছে না, যাতে তারা স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করে তাদের

ভীতিপ্রদর্শন করতে পারে; যেন তারা বাঁচতে পারে (সূরা : তাওবা : ১২২)। আর আলেম সমাজেরও উচিত। গুরুত্ব সহকারে তাদের ধর্মীয় অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

'দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদের পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।' (সূরা : মায়েদা : ৬৩)

হাদীসের আয়নায় উলামায়ে কেরামের মান ও আসন

ইলমে ওহীর ধারা হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু হয়ে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি লাভ করে। ইসলাম ধর্মও আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। স্বাভাবিক নিয়মেই শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তাঁর আনীত শাশ্বত জীবনবিধান ইসলামের ধারক-বাহক হিসেবে তিনি আলেম সমাজকে নির্বাচিত করেছেন। তিনি স্পষ্ট ঘোষণ করেছেন, 'আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।' (আবু দাউদ,৩৬৪১)। নবীদের এ উত্তরাধিকার আমানতকে উলামায়ে কেরাম শত প্রলয় তুফান, তাপ-উত্তাপ রৌদ্র-ঝড় পেরিয়ে, শত মুসিবতের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, বিভীষিকাময় বন্ধুর পথ মাড়িয়ে জীবনের সব সুখ-ভোগ, আনন্দ-উৎসব বিসর্জন দিয়ে হাজারো বছর ধরে হৃদয় থেকে হৃদয়ে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অর্পিত করেছেন। প্রয়োজনে বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে সে আমানত সুরক্ষিত রেখেছেন। তাঁদের এত ত্যাগ-তিতিক্ষা, মোজাহাদা-কুরবানী ও অবিরাম সংগ্রামের কারণে আজো মুয়াজ্জিনের আজানে ঘুম ভাঙে। শত উম্মাদ কলরবে ধর্মের জয়গান শোনা যায়। স্পষ্টতই তাদের মর্যাদা সাধারণ মুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কোরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়।' (তিরমিযী : ২৯০৭)

অন্য হাদীসে এসেছে, '(সাধারণ ধর্মভীরু মুসলিম) আবেদের ওপর একজন আলেমের মর্যাদা আমার সাহাবীদের ন্যূনতম ব্যক্তির ওপর আমার মর্যাদার ন্যায়।' (তিরমিযী : ২৬৮৫)।

আলেম-উলামার এ মর্যাদার যথার্থ মূল্যায়ন কিয়ামতের দিবসে করা হবে। আল্লাহর আদালতে তাদের অন্য পাপী বান্দাদের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা দান করা হবে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিবসে তিন শ্রেণির মানুষের সুপারিশ গৃহীত হবে। নবীগণ, আলেমগণ ও শহীদগণ। (ইবনে মাজাহ : ৪৩১৩)।

উলামায়ে কেরামের এহেন মর্যাদা ও শান সত্যি খুবই ঈর্ষণীয়। তাদের এ শান, মান ও মকাম দেখে সাধারণ মুমিনদের অন্তরে ঈর্ষার উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই এ বিষয়ে ইসলাম তাদের মার্জনা করার ঘোষণা দিয়েছে। 'দুই ব্যক্তিকে নিয়ে হিংসা ও ঈর্ষা করা বৈধ। এক. যাকে আল্লাহ সম্পদশালী করেছে; অতঃপর তা সত্য ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করার তাওফিক দেওয়া হয়েছে। দুই. ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেছেন। ফলে সে তার মাধ্যমে মীমাংসা করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়।' (বুখারী : ৭৩) প্রকৃতপক্ষে নিজের বাহুবলে মর্যাদার অধিকারী হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ এক খোদাপ্রদত্ত নেয়ামত। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেছেন, তাকেই ধর্মীয় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দান করেন।' (বুখারী : হাদীস : ৭১)

রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে উলামায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত

সর্বসাধারণের মধ্যে উলামায়ে কেরামের মর্যাদা অসংখ্য হাদীসে স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও রাসূল (সা.) বিষয়টিকে উদাহরণের মাধ্যমেও বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মানুষ খনির ন্যায়। যেমন– স্বর্ণ-রৌপ্যের খনি হয়ে থাকে। যারা ইসলাম গ্রহণের আগে উত্তম ছিল, তারা ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম হবে, যদি তারা ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্বতা অর্জন করে।' বুখারী : ৩৩৮৩) অন্য হাদীসে এসেছে, উলামায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত সেসব নক্ষত্রের ন্যায়, যাদের মাধ্যমে জলে-স্থলে-অন্ধকারে পথের দিশা পাওয়া যায়। যখন নক্ষত্রগুলো আলোহীন হয়ে যায়, তখন পথচারীর পথ হারানোর উপক্রম হয়ে পড়ে।' (মুসনাদে আহমদ)

আলেমের ওফাত বিশ্বের জন্য মুসিবত

হেদায়েতকামী মানুষের জন্য আলেমগণের অস্তিত্ব আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। তাই তাদের সমূহ কল্যাণের জন্য পুরো সৃষ্টিজগৎ দু'আ করতে থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে, 'আলেমের জন্য আসমান-জমিনের সমস্ত সৃষ্টিজগৎ, এমনকি সাগরের মাছও মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে।' (আবু দাউদ : ৩৬৪১) একই সাথে একজন আলেমের ইন্তেকালে পুরো বিশ্বজগতে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক মুমিনের জন্য আসমানে দুটি দরজা রয়েছে, এক দরজা দিয়ে তার রিজিক অবতরণ করে, অন্য দরজা দিয়ে তার কথা ও আমল প্রবেশ করে। যখন সে মারা যায় দরজাগুলো তাকে হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা কাঁদতে থাকে (তিরমিযী : ৩২৫৫) অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেছেন,

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ

আসমান ও জমিন তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি। (দুখান : ২৯)। মূলত এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, কোনো আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে বিশ্বজগতে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্ব স্ব ভাষায়, ভঙ্গিমায় তারা অঝোরে অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আলেমের মৃত্যু এমন মুসিবত, যার কোনো প্রতিকার নেই। এটি এমন ক্ষতি, যার ক্ষতিপূরণ নেই। আলেমের মৃত্যু মানেই একটি নক্ষত্রের আলোহীন হয়ে যাওয়া। একজন আলেমের মৃত্যু অপেক্ষা একটি গোত্রের মৃত্যু অতি নগণ্য ব্যাপার।' (বায়হাকী) আলেমের ইন্তেকালে হেদায়েতের আলোকবর্তিকা নির্বাপিত হয়ে যায়। জ্ঞান প্রদীপ নিভে যায়। গোমরাহি ছড়িয়ে পড়ে। অজ্ঞতা ও মূর্খতা বৃদ্ধি পায়। দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দিশেহারা মানুষ পথের সন্ধানে দৌড়াতে থাকে, কিন্তু কোনো পথনির্দেশক খুঁজে পাওয়া যায় না। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা মানুষের (দিল ও দেমাগ) থেকে ইলমকে সম্পূর্ণরূপে বের করে নেবেন না; বরং উলামায়ে কেরামের ইন্তেকালের মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নেবেন। এমনকি যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনেই ফতওয়া দেবে। পরিণতিতে নিজে তো পথভ্রষ্টই ছিল, অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে।' (বুখারী : ১০০)

উলামায়ে কেরাম হলেন নবুয়াতের ঝাণ্ডাবাহী, দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী, ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণকারী হেদায়েতের ধ্রুব তারা। তারা দৃঢ়তার সঙ্গে ইসলামের অনুসরণ করে। ভর্ৎসনাকারী, ক্ষমতাবান ও বিত্তবানের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে। তারা ধর্মের বাণী পৌঁছে দেয়। কোরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে বাতেলের সব ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে, মূর্খতাপ্রসূত ধর্মের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি সাধনকে রুখে দেয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'পরবর্তী প্রত্যেক প্রজন্ম থেকে এ ইলমকে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা গ্রহণ করবে। (ধর্মীয় ব্যাপারে) সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতিসাধনকে তারা রুখে দেবে। বাতিল পন্থীদের মিথ্যাচারকে তারা প্রতিহত করবে। অজ্ঞদের অপব্যাখ্যাকে তারা ছুড়ে ফেলবে। (মুসনাদে বাযযার : ৯৪২৩)

প্রকৃতপক্ষে আলেমগণই যুগে যুগে এ গুরুদায়িত্বের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। ধর্ম উন্নত জীবনবোধের জন্য। পাপমুক্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি ধর্মই দেয়। সমাজের অনাচার-পাপাচার ও অবিচার রোধে ধর্মের বিকল্প নেই। মহৎ জীবনের জন্য নৈতিকতার কথা বলা হয়ে থাকে। ধর্মই নীতি-নৈতিকতার মূল ভিত্তি। ধর্মবিবর্জিত সমাজে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য থাকে না, সেখানে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। মানবতার অপমৃত্যু হয়। উলামায়ে কেরাম সে ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই একজন আলেমের মৃত্যু কেবল ধর্মের জন্যই ক্ষতিকর নয়; মানব সভ্যতার জন্য এটা চরম অকল্যাণ বয়ে আনে। রাসূল (সা.) বলেছেন, আলেমের মৃত্যুতে ইসলামে যে ছিদ্রের সৃষ্টি হয়, দিন-রাতের বিবর্তনে কোনো বস্তুই তাকে বন্ধ করতে পারে না (পূরণ করতে পারে না)।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের দৃষ্টিতে উলামায়ে কেরামের মর্যাদা

হযরত আলী (রা.) বলেন,

অহংকার করার অধিকার কেবল আলেমদের রয়েছে, তারা নিজেরাও সত্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত আর সত্যপ্রিয়দের জন্যও পথনির্দেশক। মহৎ কর্মেই মানুষের মর্যাদা নিহিত, অজ্ঞরাই আলেমদের শত্রু। তুমি এমন ইলম অর্জন করো, যার মাধ্যমে তুমি অনন্তকাল জীবিত থাকবে, মানুষ তো মৃতপ্রায় আর আলেমরা তো জীবন্ত। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা হজরত সুলায়মান (আ.)-কে ইলম, সম্পদ ও রাজত্ব থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি ইলমকে সম্পদ ও রাজসিংহাসনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে ইলমের সঙ্গে সম্পদ সিংহাসনও দিয়ে দিয়েছিলেন।' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) বলেন, 'মানুষ বলতেই আলেমদের বোঝায়। কেননা পশুদের থেকে মানুষদের কেবল ইলমই পৃথক করে।'(তুহফাতুত ত্বলাবাহ ওয়াল উলামা)।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, যদি আলেমগণ না থাকতেন, তাহলে মানুষ সব পশুদের ন্যায় হয়ে যেত।' (আত্তালিকুসসাবিহ) হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ (রহ.) বলেন, 'উম্মতে মুহাম্মাদীর আলেমগণ মা-বাবার চেয়েও অধিক দয়ালু ও অনুকম্পার অধিকারী। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, কিভাবে? তিনি উত্তর দিলেন, 'মা-বাবা সন্তানদের পার্থিব দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষা করে, আর আলেমগণ তাদের পরকালের অনন্ত জীবনের অনির্বাণ আগুন থেকে রক্ষা করে।' (তুহফাহ)

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর এ কথাটি বর্ণনা করেছেন যে উলামায়ে কেরামের কথা শোনা ও তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করা আমার কাছে অসংখ্য ফিকহী মাসায়েল চর্চা করার চেয়েও অধিক প্রিয় (জামিউ বয়ানিল ইলমী ওয়া আহলিহি খণ্ড : ১, পৃ. ৫০৯) আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উলামায়ে কেরামের শান, মান, মর্যাদা ও মকাম উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১১

লা-মাযহাবীদের আরো কয়েকটি মাস'আলা :

এখন আপনাদের সামনে লা-মাযহাবীদের আরো কয়েকটি মাস'আলা উপস্থাপন করব। এসব মাস'আলা শুধু পুরো মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই নয়, বরং সম্পূর্ণ কোরআন-হাদীস পরিপন্থী। অনুক্ষণ তাকলীদের বিষোদগারে প্রবৃত্ত থাকলেও তাকলীদের প্রতি তাদের যে কত অনির্বচনীয় অনুরাগ আর ঝোঁক, তা এখান থেকে সহজেই অনুমেয়। কথিত ইমামদের মতকে তারা কোরআন-সুন্নাহর ওপর কতটা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, তার কিঞ্চিৎ ঝলক দেখতে পাবেন সামনের আলোচনাতে। আমরা বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধুমাত্র বিষয়গুলোকে বর্ণনা করছি।

১. মৌলভী আব্দুল্লাহ, লা-মাযহাবীদের মান্যবর পুরোধা। দিল্লিতে তাঁর যশ-খ্যাতি অবিশ্বাস্য। লা-মাযহাবীরা তার ফতওয়াকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করে থাকে। তাঁর একটি ফতওয়া দেখুন, কোনো বেশ্যা নারী যদি তার অতীত কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হয়ে তাওবা করে, তাহলে তার পূর্বের ব্যাভিচারলব্ধ সব সম্পদ হালাল এবং পূতপবিত্র হয়ে যাবে। (তিনি এই ফতওয়াটি দিয়েছেন ২৩ রবিউল আখের ১৩২৯ হি.)

২. কোনো অমুসলিমের জবাইকৃত পশু খাওয়া মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। পবিত্র কোরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে এ বিধান বিবৃত হয়েছে। কিন্তু লা-মাযহাবীদের মতে তা খাওয়া সম্পূর্ণ বৈধ। (দলিলুত্তালিব-৪১৩)

৩. কোনো পশু যদি জবাই ব্যতীত মারা যায় তবে তা মৃত এবং অপবিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। এটাই উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কিন্তু লা-মাযহাবীদের মতে তা অপবিত্র নয়। (দলিলুত্তালিব-২২৪)

৪. শূকর সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ভাষ্য মতে অপবিত্র। শুধু অপবিত্রই নয়, বরং তা নজিসুল আইন তথা সত্তাগতভাবে অপবিত্র। কিন্তু লা-মাযহাবীদের মান্যবর পুরোধা নবাব সিদ্দিক হাসান বলেন, শূকর পবিত্র। (বুদুরুল আহিল্লা-১৫-১৬)

৫. মানুষসহ সমস্ত পশুপাখির রক্ত অপবিত্র। এতে কারো কোনো ধরনের দ্বিমত নেই; কিন্তু লা-মাযহাবীদের ভাষ্য হচ্ছে, হায়য এবং নেফাসের রক্ত ব্যতীত মানুষ এবং অন্যান্য পশুপাখির রক্ত সম্পূর্ণ পবিত্র। (দলিলুত্তালিব-১৩০, বুদুরুল আহিল্লা-১৮)

৬. ব্যবসার সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় না। (বুদুরুল আহিল্লাহ-১০২) যাকাত সম্পর্কে এমন উদ্ভট মন্তব্য কেবল লা-মাযহাবীদের পক্ষেই শোভা পায়।

৭. লা-মাযহাবীদের মতে, পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত ছয়টি বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে সুদ নেওয়া বৈধ। (দলিলুত্তালিব)

৮. তাদের মতে, সোনা-রুপার অলংকারাদিতে যাকাত ফরয হয় না। (বুদুরুল আহিল্লা-১০১)

৯. তারা শরাবকে পাক এবং পবিত্র মনে করে। (দলিলুত্তালিব-৪০৪, বুদুরুল আহিল্লা-১৫) শরাব সম্পর্কে এমন গাঁজাখুরি মন্তব্য আর কেউ করেছে কি না, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

১০. লা-মাযহাবীদের মতে, বীর্য পাক। (বুদুরুল আহিল্লাহ-১৫)

১১. লা-মাযহাবীদের ভাষ্য মতে, সমস্ত পশুপাখির প্রস্রাব পাক। (বুদুরুল আহিল্লা ১৪-১৫)

১২. লা-মাযহাবীদের মতে, সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহার করা বৈধ। (বুদুরুল আহিল্লা-৩৫৪)

১৩. লা-মাযহাবীদের মতে, কোনো ব্যক্তি যদি অপবিত্র শরীরে নামায পড়ে, তার নামায হয়ে যাবে। তবে সে গোনাহগার হবে। (বুদুরুল আহিল্লা-৩৮) অথচ আমাদের মতে, নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য মুসল্লির শরীর পাক-পবিত্র হওয়া অন্যতম শর্ত।

১৪. লা-মাযহাবীদের মতে, আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা সম্পূর্ণ বিদ'আত। (আল বুনইয়ানুল মারচুচ-১৭৩) চিন্তার বিষয় হলো, আল্লাহ আল্লাহ যিকির করাকে যারা বিদ'আত আখ্যা দিয়ে পুরো ধরিত্রীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, তারা ইসলাম নামক বৃক্ষের গোড়ায় পানি ঢালছে, না ওই গাছটাকে সমূলে উপড়ে ফেলার দুরভিসন্ধিতে নিবিষ্ট?

১৫. লা-মাযহাবীদের মতে, অনেক সাহাবী কট্টর পথভ্রষ্ট এবং গোনাহগার ছিল। (আল বুনইয়ানুল মারচুচ-১৮৪) এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. লা-মাযহাবীদের মতে, মহিলাদের শরীর খোলা থাকাবস্থায়ও তাদের নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। মাথাটা ঢাকলেই যথেষ্ট। পুরো শরীর ঢাকা অনর্থক।

(বুদুরুল আহিল্লা-৩৯)

১৭. উদ্ভট বিধান তৈরিতে লা-মাযহাবীদের মুনশিয়ানা সত্যিই বিস্ময়কর। তাদের মতে, গোড়ালির নিচে পায়জামা পরিধান করলে ওজু ভেঙে যাবে। (দস্তুরুল মুত্তাকী-২৯)

১৮. শরীয়তের বিধানের কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। তারা বলে, কোনো ব্যক্তি যদি রামাজানে রোযা অবস্থায় স্বেচ্ছায় পানাহার করে, তার রোযার কাফফারা দিতে হবে না। (দস্তুরুল মুত্তাকী-১০৩)

১৯. লা-মাযহাবীদের মতে, মাথা মুণ্ডানো সুন্নাত পরিপন্থী এবং খারেজীদের বিশেষ নিদর্শন। (আল বুনইয়ানুল মারচুচ-১৬৯)

২০. তাদের মতে, শরীর থেকে রক্তের বন্যা বয়ে গেলেও ওজু ভাঙবে না। (দস্তুরুল মুত্তাকী-২৯)

এ ছাড়া লা-মাযহাবীদের অসংখ্য মাস'আলা এমন আছে, যেগুলোতে তাদের কাছে না কোরআনের আয়াত আছে, না হাদীস শরীফের কোনো প্রমাণ আছে। স্রেফ নিজেদের স্বভাবজাত হঠকারিতা এবং প্রগলভতার বশবর্তী হয়ে তারা এসব চিহ্নিত মাস'আলা নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত। তাদের মাঝে না আছে ধর্মের প্রতি কোনো দায়বোধ, দ্বীনের প্রতি ন্যূনতম মমত্ববোধ বরং উম্মাহর সামগ্রিক সংহতিতে ফাটল ধরানোর ঘৃণ্য মানসিকতাই তাদের চলার পথের পাথেয় এবং সাদা ভল্লুকদের লেজুড়বৃত্তির মূল উপাদান। তাদের অন্ধকার জগতের এসব গোমর যদি উম্মাহর সামনে ফাঁস করে সঠিক কর্মপদ্ধতি উন্মোচন করা না হয়, তাহলে পুরো উম্মত সন্দেহ-সংশয়ের বিবরে আটকা পড়বে। সত্য অবগুণ্ঠিত হয়ে পড়বে। বাতিলের আস্ফালন সীমা ছাড়িয়ে যাবে। আহলে হকের জীবদ্দশায় সত্য মুখ থুবড়ে পড়বে, এটা তাদের জন্য বড়ই লজ্জাজনক। উম্মাহর এমন বিপদসংকুল মুহূর্তে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.)-এর ঈমানদীপ্ত সেই বজ্রনিনাদের কথা স্মরণ করুন,

اينقص الدين وانا حى

আমি আবু বকর জীবিত থাকব, আর আল্লাহর প্রিয় দ্বীনের কোনো ক্ষতি হবে! অসম্ভব!

এখন আমাদের সামনে সেই সিদ্দিকি অবিনাশী চৈতন্যে গর্জে ওঠার সময়। হাদীসের ওপর আমল করার মনোলোভা মোড়কে রাসূলের সুন্নাতকে অস্বীকার করা হবে, আর আমরা জীবিত থাকব? তা কি সম্ভব?

লা-মাযহাবীদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা :

লা-মাযহাবীরা বলে থাকে, আমরা শুধু কোরআন-হাদীস মানি, ফিকাহ আমরা মানি না। অর্থাৎ তারা চার ইমাম কর্তৃক সংকলিত ফিকাহকে কঠোরভাবে অস্বীকার করে। তবে কথিত ইমামদের ফিকাহর গুরুত্ব তাদের কাছে কোরআন-হাদীসের চেয়ে সহস্র গুণ বেশি। নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত ফিকাহকে অস্বীকার করে অনির্ভরযোগ্য ফিকাহকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা কেবল লা-মাযহাবীদের পক্ষেই সম্ভব।

বুখারী শরীফ বনাম লা-মাযহাবী

বুখারী শরীফ নিয়ে লা-মাযহাবীদের লাফালাফি রীতিমতো উদ্বেগজনক। তাদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়, এ জগতে যেন বুখারী শরীফ ব্যতীত হাদীসের অন্য কোনো গ্রন্থই নেই। কোনো হাদীস বুখারী শরীফে না থাকলে সে হাদীস আমলযোগ্য নয়। এ ধরনের গোয়েবলসীয় অপপ্রচারে তারা সে কি অন্তপ্রাণ! পবিত্র কোরআনের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ বুখারী শরীফ–এ নিয়ে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু বুখারী শরীফ ব্যতীত অন্য গ্রন্থের হাদীস আমলযোগ্য নয়, এখানেই তাদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। কিন্তু ভেল্কিবাজিতে লা-মাযহাবীদের সাথে কুলিয়ে ওঠা বড়ই দায়। একদিকে বুখারী শরীফ, বুখারী শরীফ বলে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তুললেও তাদের স্বার্থ পরিপন্থী হলে বুখারী শরীফকে অগ্রাহ্য করতেও তাদের একটুও কুণ্ঠাবোধ হয় না। আমি পূর্বের আলোচনাতেও বলেছি, তাদের সর্বপ্রথম মাস'আলা তথা সীনার ওপর হাত বাঁধা সম্পর্কে বুখারী শরীফ সম্পূর্ণ নিশ্চুপ।

বুখারী শরীফের সাথে লা-মাযহাবীদের দ্বন্দ্বের ফিরিস্তি

বুখারী শরীফের সাথে লা-মাযহাবীদের দ্বন্দ্বের ফিরিস্তিও অনেক দীর্ঘ। এ বিষয়ের ওপরও কিছুটা আলোচনা করেছি এ পুস্তিকাতে। যেমন ধরুন–

১. আমি এই মাত্র যে মাস'আলাটি বর্ণনা করলাম, ইমাম বুখারীর মত হচ্ছে, মহিলারা নামায পড়তে মসজিদে যাবে না। কিন্তু লা-মাযহাবীরা মহিলাদেরকে নামায পড়তে মসজিদে যেতে বাধ্য করে থাকে।

২. বুখারী শরীফে বলা হয়েছে, মুসাফাহা দুই হাতে করা সুন্নাত। কিন্তু লা-মাযহাবীরা বলে থাকে, মুসাফাহা করতে হবে এক হাতে।

৩. বুখারী শরীফে 'তানঈম' নামক স্থান হতে ওমরাহ করাকে বৈধ বলা হয়েছে। অথচ লা-মাযহাবীরা উক্ত স্থান হতে ওমরাহ করাকে বিদ'আত আখ্যা দিয়ে থাকে।

৪. বুখারী শরীফে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে, এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে

তিন তালাকই পতিত হবে। কিন্তু লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হচ্ছে, এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে এক তালাকই পতিত হবে।

৫. বুখারী শরীফে জুমার পূর্বে দুবার আযান দেওয়াকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম নিদর্শন বলা হয়েছে, অথচ তারা জুমার প্রথম আযানকে বিদ'আত আখ্যা দিয়ে থাকে।

৬. বুখারী শরীফে স্পষ্ট বর্ণিত আছে, যদি কোনো সময় জুমা ও ঈদের দিন এক হয়ে যায়, তাহলে উভয় নামাযই আদায় করতে হবে। কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যাবে না। অথচ তারা জুমার নামায পড়তে হবে না মর্মে ফতওয়া প্রদান করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ ওপরে কয়েকটি মাস'আলা পেশ করেছি মাত্র। ইমাম বুখারীর সাথে লা-মাযহাবীদের মতবিরোধের দাস্তান অনেক দীর্ঘ। অনেককে বলতে শোনা যায়, লা-মাযহাবীরা ইমাম বুখারীর মতকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই ধারণা সর্বতোভাবে ভুল। এ ধরনের অমূলক এবং ভিত্তিহীন ধারণার একমাত্র কারণ জ্ঞানগত রিক্ততা আর দৈন্যতা বৈ কিছুই নয়। বুখারী শরীফের সাথে তাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। বরং তারা বুখারী শরীফের সবচেয়ে বড় দুশমন।

হাদীসের দুশমন

আমি তো প্রায় বলি, তাদেরকে আহলে হাদীস নয়, বরং মুনকিরীনে হাদীস নামে সর্বত্র পরিচিত করা দরকার। কারণ, হাদীসের একনিষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষীর লেবেল এঁটে হাদীসকে সন্দেহযুক্ত আর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করাই তাদের উদয়াস্তের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য।

একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ

অনেক লা-মাযহাবী হয়তো পূর্বোক্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলতে পারে, আমরা বাস্তবিক অর্থে সহীহ হাদীসের প্রকৃত অনুসারী। প্রত্যুত্তরে আমরা মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার হাত বাঁধা সম্পর্কীয় বিশুদ্ধ হাদীসটা উপস্থাপন করব। যে হাদীসের ওপর লা-মাযহাবীরা আমল করে না। বরং এর বিপরীতে তারা সনদ এবং মতন উভয় দিক থেকে অতিশয় দুর্বল একটি হাদীসের ওপর আমল করে থাকে। যদি তারা পূর্বের দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করা ছেড়ে এই সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা আরম্ভ করে তাহলেই বোঝা যাবে, তারা সহীহ হাদীসের ওপর সঠিক আমলকারী। অন্যথায় তারা.....

বাস্তব কথা হলো, তারা না কোরআনের ওপর আমল করে, না হাদীসের ওপর আমল করে। বরং তারা সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য হাদীসের ওপর আমল করার ছদ্মাবরণ নেয়।

চার মাযহাব কি বিভক্তি সৃষ্টির জন্য?

লা-মাযহাবীরা এই বলে প্রোপাগান্ডা চালায় যে চার মাযহাব সৃষ্টির মাধ্যমে উম্মতের মাঝে বিরাট মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। উম্মাহর সংহতি বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাসের সাথে বলছি, আমাদের চার মাযহাব সৃষ্টি এটা উম্মতের মাঝে কোনো মতানৈক্য নয়, বরং তারাই উম্মাহর মাঝে মতানৈক্য এবং বিভেদের মহাপ্রাচীর দাঁড় করিয়েছে। তারা বলে, চার মাযহাবের চারটা ভিন্ন ভিন্ন ফতওয়া। এটা উম্মাহকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দেওয়া নয় কি? যেমন ধরুন, হানাফী মাযহাবে রক্ত বের হলে ওজু ভেঙে যায়; কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবে রক্ত বের হলে ওজু ভাঙে না। হানাফী মাযহাব মতে মহিলাদের স্পর্শ করার দ্বারা ওজু ভাঙে না। কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবে এর দ্বারা ওজু ভেঙে যায়। তারা এই ছোটখাটো বিষয়গুলোকে অনেক বড় করে দেখায়। তিলকে তাল করা তো তাদের স্বভাবজাত বিষয়। এসব উদাহরণ দিয়ে তারা এটাই বোঝাতে চায় যে চার মাযহাব সৃষ্টি উম্মাহর মাঝে অনৈক্য বৈ কিছুই নয়। কিন্তু বন্ধুরা! খুব গুরুত্ব সহকারে শুনুন! এসব হচ্ছে শাখাগত মতানৈক্য এবং এই মতানৈক্য স্বাভাবিকও বটে। এই মতানৈক্যকে হাদীসের ভাষায় রহমত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাই তো ইসলামের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় উত্থান-পতন হয়েছে; কিন্তু কখনো হানাফী-শাফেয়ী কিংবা হানাফী-মালেকী কিংবা হানাফী-হাম্বলী দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়নি এবং ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না। বরং তাদের পরস্পরে সৌহার্দ্য, হৃদ্যতা ইতিহাসের কিংবদন্তি হিসেবে স্বীকৃত। তারা প্রত্যেকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মতের সপক্ষে রয়েছে কোরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি।

প্রত্যেক ইমাম নিজের মাযহাব এবং অন্যের মাযহাব সম্পর্কে কী বিশ্বাস পোষণ করতেন, তা হানাফী মাযহাবের যশস্বী ভাষ্যকার ইমাম আলাউদ্দীন হাছকফীর কণ্ঠে সুনিপুণভাবে অনুরণিত হয়েছে। তিনি বলেন–

مذهبنا صواب يحتمل الخطا ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب

আমাদের মাযহাব সঠিক, যদিও (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনাও রয়েছে। আর আমাদের বিপরীত মাযহাবগুলো মনে করি ভুল-ত্রুটিপূর্ণ, তবে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

(আদ্দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতারসহ ১/৪৮)

হানাফী মাযহাবের প্রথিতযশা মুহাদ্দিস আল্লামা তাহাবী (রহ.) লিখেন, এ উক্তির সারমর্ম এই যে প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীগণ তার মাযহাবের ইমাম সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করবে যে আমাদের ইমাম সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তবে ভুল-ত্রুটিরও আশঙ্কা আছে। কেননা, প্রত্যেক মুজতাহিদের ক্ষেত্রেই সঠিক ও বেঠিকের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সাধারণভাবে আমরা বলব যে ইমাম চতুষ্টয় প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধারণা ও প্রচেষ্টাবলে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৪৮)

সারাংশ হচ্ছে, চার মাযহাবের কারণে উম্মতের মাঝে কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি হয়নি। বরং লা-মাযহাবীরাই যূথবদ্ধ উম্মাহর সামনে অনৈক্যের বড় প্রতীক। লা-মাযহাবীরা চার ইমামের তাকলীদকে শিরক আখ্যা দিলেও তাদের গ্রন্থগুলোতে ইবনে তাইমিয়া, কাযী শাওকানী, আল্লামা ইবনে হাযম জাহেরী, দাউদ জাহেরী, ইবনুল কায়্যিম, নাসিরুদ্দীন আলবানী, ওয়াহীদুজ্জামান হায়দারাবাদী, সিদ্দিক হাসান ভুপালী, নুরুল আজম ভুপালী, মুহাম্মদ জুনাগড়ী, সানাউল্লাহ আমরতছরী, মিয়া নজীর হোসাইন প্রমুখের ভূরি ভূরি বক্তব্য পাওয়া যায়। বরং এ কথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না, লা-মাযহাবীদের নিজস্ব কোনো বক্তব্যই নেই, বরং ইবনে তাইমিয়্যা থেকে কতটুকু, ইবনুল কায়্যিম থেকে কতটুকু, এভাবে জগাখিচুড়ি মার্কা বক্তব্যে ঠাসা তাদের গ্রন্থগুলো। লা-মাযহাবীরা ইসলামের ছয় শত শতাব্দী বাদ দিয়ে ইবনে তাইয়্যিমা এবং ইবনুল কায়্যিমের প্রতি দ্রুত অবনমনের মূল কারণ হলো, যেহেতু বর্তমান সৌদি সরকার ইবনে তাইয়্যিমা আর ইবনুল কায়্যিমকে নিজেদের প্রধান ইমাম মনে করে থাকে, সুতরাং তাদের নাম নেওয়ার অর্থই হলো, কাঁড়ি কাঁড়ি রিয়ালের সম্ভাবনার অপার হাতছানি। নিজেদের আলোকিত এবং শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষের দ্বীন ধর্ম বিকিয়ে যারা লা-মাযহাবী ট্যাগ ধারণ করেছে, তাদের পক্ষে এ ধরনের রজতলিপ্সার সম্ভাবনাময়ী হাতছানি উপেক্ষা করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

প্রয়োজন একটু সচেতনতা

কোনো লোক যখন লা-মাযহাবী হয়ে যায় তখন তার অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, মুকাল্লিদদের কাছে হাদীসের ছিটেফোঁটাও নেই। লা-মাযহাবী পুরোধারা তাদের অনুসারীদেরকে এই কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করে, হাদীসের প্রকৃত অনুসারী আসমানের নিচে, যমিনের ওপর একমাত্র আমরাই। মাযহাবপন্থীদের কাছে তাদের ইমামদের বক্তব্য আর মতামত ছাড়া আর কোনো পুঁজি নেই। সুতরাং তাদের সাথে বিতর্কে অবতরণে তোমরা মোটেও চিন্তিত হয়ো না। এ ধরনের গোয়েবলসীয় অপপ্রচারের শিকার হয়ে সাধারণ লা-মাযহাবীরাও মাযহাব পন্থীদের বিরুদ্ধে এত উগ্র আর বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়, সাধারণ লা-মাযহাবীদের সাথে আলোচনাকালে আমাদের বক্তব্যকে যদি একটু সচেতনভাবে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে তারা তা গ্রহণ করতে খুব একটা পিছপা হয় না। আপনাদের যে নকশাটি দেওয়া হয়েছে তা মূলত হায়দারাবাদের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই তৈরি করা হয়েছে।

হায়দারাবাদের দাস্তান

হায়দারাবাদে যখন সর্বপ্রথম এই ফিতনার প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হয়, তখন প্রায় সব মসজিদে মুসলমানরা সীনার ওপর হাত বাঁধা আরম্ভ করে। এখন লা-মাযহাবীদের বিরুদ্ধে কাজ করার দুটি পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতি হলো, প্রতিটি মসজিদে মসজিদে তাদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়া, তাদের বিরুদ্ধে কনফারেন্স করা, লিফলেট বিতরণ করা ইত্যাদি। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, তাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় কথা সাগ্রহে শুনতে চায়, তাদেরকে এসব বিষয়ের বাস্তবতা অনুধাবন করার নিমিত্তে কিছু কিছু কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করা। কিন্তু এর জন্য বিচক্ষণ, বিনয়ী এবং ধৈর্য্যশীল লোকের প্রয়োজন। কেননা এসব বিষয়ে রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।

রাগ সংবরণ করা অত্যধিক জরুরি

শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহয়া মুনীরী (রহ.) একজন উঁচুমাপের বুজুর্গ ছিলেন। তিনি একটা চমৎকার কথা বলেছেন,

غصہ بدترین سوار اور بہترین سواری ہے

অর্থাৎ, কেউ যদি রাগের সামনে মাথা নোয়ায় তাহলে সে সোজা জাহান্নামে চলে যাবে। আর কেউ যদি রাগকে কন্ট্রোল করতে পারে তাহলে তার জন্য চিরস্থায়ী শান্তির আবাসভূমি জান্নাত অবধারিত। অনেকেই বলে থাকে, আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গরা অনেক বেশি غصہ রাগ করে থাকতেন। আমাদের হাকীম সাহেব বলেন যে এটা غصہ বা রাগ নয়, বরং جلال জালাল। কারণ রাগ অত্যন্ত ঘৃণিত এবং জালাল বরিত একটা গুণ। আমাদের আকাবের দ্বীনের ক্ষেত্রে متشدد বা উগ্রপন্থী নয় বরং متصلب বা কঠোর ও অনমনীয়। দ্বীনের জন্য তাঁদের অন্তরে ছিল নিখাদ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা কিন্তু চরম পন্থা এবং

উগ্রপন্থাকে তারা কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। জীবনের প্রতিটি সেক্টরে বিশেষত লা-মাযহাবীদের সাথে বিতর্ককালে নিজেকে অনেক বেশি কন্ট্রোল করা দরকার। তারা উস্কানিমূলক কথার বাণে জর্জরিত করলেও কখনো যেন উন্মত্ততা আর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে। কাজটা অনেক কঠিন বিধায় এ কঠিন কাজটা শুধুমাত্র ওই সব ব্যক্তির পক্ষে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব, যাদের সাথে মহান আল্লাহর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শেষ রাতের তাহাজ্জুদের প্রতি যাদের অনির্বচনীয় সখ্য আর অনুরাগ রয়েছে।

হযরত মাদানী (রহ.)-এর এখলাস

কুতবুল আলম, ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের অগ্রপুরুষ, শাইখুল ইসলাম হযরত সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) সম্পর্কে সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) একটা আশ্চর্যজনক মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায়, হযরত মাদানী (রহ.) শেষ রজনীতে যে তাহাজ্জুদ পড়তেন অথবা দেওবন্দের দারুল হাদীসে বুখারী শরীফের দরস দিতেন, অন্যদিকে সারা দিন রাজনৈতিক প্রোগ্রাম, সেমিনার, সমাবেশে উদ্দীপ্ত ভাষণ প্রদান করতেন, সব কিছুর উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। আর তা হলো, মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাই হাদীসের দরস যেমন তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি রাজনৈতিক সমাবেশের গুরুত্বও তাঁর কাছে কোনো অংশেই কম ছিল না।

আবার উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন

আবার হায়দারাবাদের ঘটনার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হায়দারাবাদে যখন এই ফিতনা আশঙ্কাজনক হারে নিজের ডালপালা বিস্তার করতে লাগল তখন আমাদের উলামায়ে কেরাম মাশাআল্লাহ অত্যন্ত সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে কাজ আরম্ভ করেন। তাঁরা স্থানীয় মুসল্লিদেরকে এক নামাযের পর বসিয়ে বললেন, মাশাআল্লাহ! সহীহ হাদীসের ওপর আমল করার আপনাদের যে অনির্বচনীয় আগ্রহ এবং উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে বিষয়টা নিয়ে আমরা পরস্পরে খোলামেলাভাবে আলোচনা করলে সবাই উপকৃত হতাম। আলোচনার পরও যদি আপনাদের মনে হয় সীনার ওপর হাত বাঁধাটাই সুন্নাত, তাহলে আমরা বাঁধা দেব না। আপনাদের পূর্বপুরুষরা নাভির নিচে হাত বাঁধত, আপনারাও এত দিন নাভির নিচেই হাত বাঁধতেন, কিন্তু এর স্বপক্ষে আপনাদের প্রমাণ জানা ছিল না। এরপর লা-মাযহাবীরা আপনাদেরকে সীনার ওপর হাত বাঁধা সুন্নাত বলে তার পক্ষে হাদীস দেখায়। এবং এখানে তারা মারাত্মক শঠতা এবং ধোঁকার আশ্রয় নেয়। সরলপ্রাণ মুসলমান হিসেবে আপনারাও তাদের জালে ফেঁসে গেলেন। এখন আমরা আপনাদের সামনে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি উপস্থাপন করব এবং সব দলিলের পর্যালোচনা করব। এরপর কোন মত আমলযোগ্য এবং কোন মত আমলযোগ্য নয়, সে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব আপনাদের ওপর রইল। এখন আপনারা অনুমতি দিলে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি। তখন লোকদের মাঝে কানাঘুষা শুরু হলো। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, লোকদেরকে চিন্তা-ফিকির করার সময় দিতে হবে। তাদের ওপর জবরদস্তিমূলক কোনো মত চাপিয়ে দেওয়া হলে তা টেকসই হয় না। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, ভাই! তারা তো সঠিক কথাই বলছে। তাদের কথা শোনা দরকার। অনেক লোকের জমায়েত হলো। আমাদের পক্ষের আলেমরা বয়সে নবীন হলেও তাদের কথাবার্তায় প্রজ্ঞা এবং আন্তরিকতার কমতি ছিল না। লোকদের সামনে তারা নাভির নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কীয় হাদীসগুলো (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, আছারুস সুন্নাহসহ সাহাবায়ে কেরামের ধারাবাহিক কর্মপরম্পরা) উপস্থাপন করতে লাগল, সাথে সাথে علی صدرہ তথা সীনার ওপর হাত বাঁধার সংযোজন কিভাবে হলো, এসব আলোচনা জনসাধারণের পরিভাষা ব্যবহার করে উপস্থাপন করা হলো, তখন আল্লাহু আকবর ওই মজলিসের সমস্ত লোক নিজেদের কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে কায়মনোবাক্যে তাওবা করতে লাগল। তারা বলতে লাগল, আমাদের অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে। আমরা হাদীসের ওপর আমল করার মানসেই মাযহাব পরিত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু ধূর্ত লা-মাযহাবীরা আমাদের ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, তা তো আমাদের কল্পনাতেও ছিল না।

নাভির নিচে হাত বাঁধার মাস'আলা নিয়ে কয়েকটি কথা

এ বিষয়টি এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার কারণ হলো, এই মাস'আলাটি নিয়ে যদি লা-মাযহাবীদের শক্তভাবে ধরা হয়, তাহলে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়ে যাবে।

১. কোনো হাদীস বুখারীতে না থাকলে তা আমলযোগ্য নয় বলে লা-মাযহাবীরা প্রচারণা চালালেও নাভির ওপর হাত বাঁধা সম্পর্কে কোনো বর্ণনা ইমাম বুখারী নিয়ে আসেননি। সুতরাং তারা সূচনালগ্নে একটা বিরাট ধাক্কা খেয়ে যাবে।

২. তারা সহীহ হাদীস, সহীহ হাদীস

বলে লম্পঝম্ফ করলেও কারা সহীহ হাদীসের প্রকৃত অনুসারী তা এ মাস'আলার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যাবে।

৩. তারা মাযহাব পন্থীদের ওপর বিশেষত হানাফী মাযহাবের ওপর এই অপবাদ দিয়ে থাকে, তাদের কাছে কোনো হাদীস নেই। তাদের এই গোয়েবলসীয় অপপ্রচারেরও দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া যাবে। এ বিষয়টি আমি সবিস্তারে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, লা-মাযহাবীদের সাথে তর্ক-বিতর্কের সময় ইলমী এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করার চেয়ে কিছু কৌশল এবং হেকমতে আমলী অধিক ফলপ্রসূ। কারণ ইলমী প্রমাণাদি আমাদের পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম এত বেশি সংকলন করে দিয়েছেন, এর একশ ভাগের এক ভাগও তাদের কাছে নেই। এসব জ্ঞানগত আলোচনা এক মজলিসেই উদ্‌গীরণ করার দরকার নেই, বরং সর্বপ্রথম জনসাধারণকে নিজের পক্ষে রাখার কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমলী ময়দানে সফলতার স্বাক্ষর রাখতে চাইলে প্রজ্ঞা এবং এসব কাজে অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হওয়ার জন্যই হায়দারাবাদের ঘটনাটি আমি এত নাতিদীর্ঘ করে উপস্থাপন করেছি।

বিশেষভাবে স্মর্তব্য

জনসাধারণের সামনে আলোচনাকালে আমরা যেন ইলমী এবং জ্ঞানগত পরিভাষা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করি। বরং জনসাধারণকে বোঝানোর লক্ষ্যে সহজ থেকে সহজ পন্থা অবলম্বন করি। কোনো বিষয়ে লা-মাযহাবীদের থেকে স্বীকৃতি নিতে হলে সেটা যেন লিখিত হয়। কারণ মিথ্যা বলা, কৃত অঙ্গীকারকে অস্বীকার করা তাদের কাছে নস্যি মাত্র। আজকের আলোচনাতে জ্ঞানগত আলোচনার চেয়ে কৌশলগত আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ লা-মাযহাবীদের সাথে জ্ঞানগত আলোচনা করবেন আপনি, কিন্তু এ বিষয়ে যে তারা অন্তঃসারশূন্য, রিক্তহস্ত। তাই তাদেরকে কৌশলের মারপ্যাঁচে ফেলে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করতে হবে। আর আমরা যারা দ্বীনের এ ইসলাহী কাজ করতে আগ্রহী, তারা যদি এসব কৌশলের সাথে নিজের খোদাপ্রদত্ত মেধা, যোগ্যতা, মনীষা ব্যবহার করে স্থান-কাল-পাত্রভেদে যে কৌশল অবলম্বন করতে হয়, তা নিয়ে কাজ করি, তাহলে মুসলমানদের ঈমানবিধ্বংসী এই লা-মাযহাবী ফেরকা তথাকথিত আহলে হাদীসের গোমর উম্মাহর সামনে ফাঁস হয়ে যাবে এবং শেয়ালের মতো লেজ গুটিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ! মহান আল্লাহর এই দুটি শাশ্বত বাণী স্মরণ রাখবেন। বলুন–সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। নিশ্চয় মিথ্যা অপসৃয়মান। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮১)

সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই এবং বিজয় অতি সন্নিকটে এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন। (সূরা সফ-১৩)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও অনুবাদ

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-১০

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

মুসলমানদেরকে কোরআনের দিকে এবং হিন্দুদেরকে বেদের দিকে ফেরার আহ্বান

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন,

The sister asked a question that a non-muslim sister asked, "there is a confusion among the Muslims, when you are neatly asked: are you Wahabi or are you Hanafi, or a Shafi, or a Maleki? So there is confusion among the Muslims. So what's the reply? I do agree with non-muslim sister that unfortunately many Muslims call different names. But when I tell the hindus go back to the Vedas and I tell the Muslims go back to the Quran (applause from the audience).

বোন যে প্রশ্ন করেছেন, 'মুসলমানদের মধ্যে একটি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি কি ওহাবী, হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী অথবা হাম্বলী। সুতরাং এ ধরনের দ্বিধা মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। এর কী উত্তর হবে? আমি অমুসলিম বোনের সাথে একমত যে দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানরা নিজেদের বিভিন্ন নাম দিয়েছে। সুতরাং আমি হিন্দুদেরকে বেদের দিকে এবং মুসলমানদেরকে কোরআনের দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান করছি।

http://www.youtube.com/watch?v=QhCKCVO5sSA

বিজ্ঞ পাঠক! ডা. জাকির নায়েক এখানে যে কথাটি বলেছেন, একটু গভীরভাবে লক্ষ করুন!

প্রথমত, এ প্রশ্নটি করেছেন একজন অমুসলিম বোন। তাঁর প্রশ্ন ছিল, মুসলমানদের মাঝে ওহাবী, হানাফী, শাফেয়ী ইত্যাদি বিভিন্ন দল আছে, এ সম্পর্কে ডা. অভিমত কী। এ প্রশ্নের উত্তরে ডা. জাকির বলেছেন-

I tell the Hindus go back to the vedas and I tell the muslim go back to the Quran.

'আমি হিন্দুদেরকে বেদের দিকে এবং মুসলমানদেরকে কোরআনের দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান করছি।'

এই কথার অভ্যন্তরীণ কোনো তাৎপর্য বিশ্লেষণ না করে, সরাসরি যদি আমরা অর্থটি মেনে নিই, তাহলে এখানে মুসলমানদেরকে মাযহাব পরিত্যাগ করে কোরআনের দিকে ফেরার কী অর্থ হবে?

১. মাযহাবের ওপরে আমল করার কারণে মুসলিম উম্মাহ ভ্রান্তিতে নিপতিত আছে। যেমন–হিন্দুরা বেদের ওপর না চলার কারণে ভ্রান্তিতে আছে।

২. কোরআন ও মাযহাবের অনুসরণ সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়। নতুবা একজন যদি মাযহাবের ওপর চলার কারণে কোরআন ও হাদীসের ওপর চলে থাকে, তবে তো তাকে পুনরায় আবার কোরআন ও হাদীসের দিকে ফিরে যেতে বলার কোনো অর্থ থাকে না। এবং বিষয়টিকে হিন্দুদের বেদের দিকে ফেরার সাথে তুলনা করা যায় না। তাহলে কি যারা মাযহাবের অনুসরণ করে আসছে, তারা কোরআন ও হাদীসের বিরোধী কারও মতের অনুসরণ করছে যে হিন্দুদের মতো মাযহাবীদেরকেও কোরআন ও হাদীসের দিকে ফেরার আহ্বান করছেন?

তিনি কোন উদ্দেশ্যে এ কথাটা বললেন, আর দর্শকরা কেন করতালি দিয়ে তাঁকে বাহবা দিলেন, আমাদের নিকট তা অস্পষ্ট।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন হলো, ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন করা হয়েছে মুসলমানদের মাযহাব সম্পর্কে, এখানে তিনি মুসলমানদের মাযহাবের বিষয়ে হিন্দু ধর্ম উত্থাপন করলেন কেন? আর তাঁর শ্রোতারাই বা কেন এ বক্তব্যের কারণে করতালি দিয়ে তাঁকে বাহবা দিলেন?

একজন মুসলমান যখন হিন্দুদেরই একটা ধর্মগ্রন্থ বেদের দিকে ফেরার আহ্বান করছে, তখন মুসলিম-অমুসলিম সকলেই কেন করতালি দিল?

বিষয়টি আমরা ডা. জাকির নায়েকের ওপর সমর্পণ করব। তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। তবে আমরা এখানে এ বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করব।

প্রথম উদাহরণ :

খালেদ ইবনে আরফাতা বলেন-

"كنت جالسا عند عمر رضى الله عنه إذ أتى برجل من عبد القيس سكنه بالسوس فقال له عمر :أنت فلان بن فلان العبدى ؟ قال :نعم قال :وانت النازل بالسوس ؟ قال :نعم فضربه بعصاة معه فقال : مالى يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر :اجلس . فجلس فقرأ عليه (بسم الله الرحمن الرحيم آلر *تلك آيات الكتاب المبين *إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون *نحن نقص عليك أحسن القصص . . .) الآية فقرأها عليه ثلاثاوضربه ثلاثا فقال الرجل :مالى يا أمير المؤمنين ؟ فقال :أنت الذى نسخت كتاب دانيال ؟ !فقال :مرنى بأمرك اتبعه قال : انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس فلئن بلغنى عنك انك قرأته أو أقرأته احدا من الناس لأنهكنك عقوبة

একদা আমি হযরত উমর (রা.)-এর নিকট বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে আব্দুল কায়েস গোত্রের একজন লোক এল। সে ছিল 'সুস' নামক স্থানের বাসিন্দা। হযরত উমর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আব্দুল কায়েস গোত্রের অমুকের ছেলে অমুক। তুমি কি সুসে অবস্থান করো? সে বলল, হ্যাঁ। হযরত উমর (রা.)-এর সাথে একটি লাঠি ছিল। হযরত উমর (রা.) তাকে লাঠি দিয়ে পেটানো আরম্ভ করলেন।

ওই লোক বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার অপরাধ কী? হযরত উমর (রা.) বললেন, বসো! লোকটি বসল। অতঃপর হযরত উমর (রা.) তেলাওয়াত করলেন–

بسم الله الرحمن الرحيم آلر *تلك آيات الكتاب المبين *إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون *نحن نقص عليك أحسن القصص . . .

'আলিফ-লা-ম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কোরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।' (সূরা ইউসুফ, আয়াত-১, ২, ৩..)

হযরত উমর (রা.) আয়াতগুলো তিনবার তেলাওয়াত করলেন এবং তাকে তিনবার প্রহার করলেন। লোকটি বলল, আমিরুল মুমিনীন! আমার অপরাধ কী?

হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই কি দানিয়াল (আ.)-এর কিতাব লিখেছো?

লোকটি বলল, আপনি আদেশ করুন! আপনি যা বলবেন, আমি তা পালন করব। হযরত উমর (রা.) তাকে বললেন, তুমি যাও! এগুলো গরম পানি এবং সাদা পশম দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দাও!

অতঃপর হযরত উমর (রা.) তাকে বললেন–

ثم لا تقرأه ولا تقرءه أحدا من الناس فلئن بلغنى عنك انك قرأته أو أقرأته احدا من الناس لأنهكنك عقوبة

'এরপর তুমিও সে কিতাব পাঠ করবে না এবং অন্যকেও তা পাঠ করতে দেবে না। যদি আমার নিকট সংবাদ আসে যে তুমি নিজে পড়েছো কিংবা অন্যকে পড়িয়েছো, তবে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করব?

অতঃপর হযরত উমর (রা.) নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন–

انطلقت أنا فانتسخت كتابا من اهل الكتاب ثم جئت به فى أديم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما هذا فى يدك يا عمر ؟ قال :قلت :يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما الى علمنا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه ثم نودى بالصلاة جامعة فقالت الأنصار : اغضب نبيكم هلم السلاح السلاح فجاؤا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم :يا أيها الناس إنى أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لى اختصارا ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية ولا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون .قال عمر :فقمت فقلت :رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبك رسولا ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم "

'একদা আমি ইহুদী-খ্রিস্টানদের নিকট থেকে তাদের একটি কিতাব সংগ্রহ করলাম। অতঃপর তা একটি চামড়ায় মুড়ে নিয়ে এলাম। রাসূল (সা.) বললেন, হে উমর! তোমার হাতে কী? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (সা.) এটি একটি কিতাব। আমি আহলে কিতাবদের থেকে অনুলিপি তৈরি করে নিয়েছি, যেন আমাদের যে ইলম রয়েছে তা এর মাধ্যমে আরো বৃদ্ধি পায়। এতে রাসূল (সা.) এতটা রাগান্বিত হলেন যে তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল।

অতঃপর আমরা নামাযের জন্য মসজিদে গেলাম।

আনসার সাহাবীগণ বললেন, তোমাদের নবী (সা.)-কে কে রাগান্বিত করেছে? অস্ত্র উঠাও! অস্ত্র উঠাও! অতঃপর তারা এল এবং রাসূল (সা.)-এর মিম্বারের সামনে একত্রিত হলো। রাসূল (সা.) বললেন, হে মানুষ সকল! নিশ্চয় আমাকে জাওয়ামিউল কালিম হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আমাকে সর্বশেষ বিষয় দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমার জন্য তা সুসংবদ্ধ করা হয়েছে।

আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ দ্বীন নিয়ে এসেছি। সুতরাং তোমরা সংশয়ের মাঝে থেকো না এবং সংশয় সৃষ্টিকারীরা যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে। উমর (রা.) বলেন, 'অতঃপর আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং বললাম–

رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبك رسولا

'আমি সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছি, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং আপনাকে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছি।'

হযরত উমর (রা.) বলেন, এরপর রাসূল (সা.) মিম্বার থেকে নামলেন।

[তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬৭-৩৬৮, আল-আহাদিসুল মুখতারা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪-২৫]

দ্বিতীয় উদাহরণ

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) মুসনাদে আহমাদে হযরত উমর (রা.) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন–

عن جابر بن عبد الله " :أن عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبى صلى الله عليه وسلم فغضب

فقال :أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها نقية لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذى نفسى بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه الا أن يتبعنى "

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একদা হযরত উমর (রা.) আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিস্টানদের নিকট থেকে একটি কিতাব সংগ্রহ করলেন। হযরত উমর (রা.) রাসূল (সা.)-এর নিকট কিতাবটি পড়লেন। রাসূল (সা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন–

'হে উমর! তুমি কী দ্বীনের বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রয়েছো? আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দ্বীন নিয়ে এসেছি। তোমরা তাদের নিকট কিছু জিজ্ঞেস করো না। কেননা হয়তো তারা তোমাদের নিকট কোনো সত্য বিষয় প্রকাশ করবে, আর তোমরা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। অথবা তারা তোমাদের নিকট কোনো ভ্রান্ত বিষয় উপস্থাপন করবে, আর তোমরা তাকে সত্যায়ন করে বসবে। আল্লাহর শপথ! হযরত মূসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর জন্য আমার অনুসরণ ব্যতীত কোনো উপায় থাকত না।

[মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮৭, তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬৭]

তৃতীয় হাদীস

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) একদা একটি কিতাব নিয়ে এলেন, যাতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা লেখা ছিল। তিনি হুজুর (সা.)-এর সম্মুখে কিতাবটি পড়ছিলেন। এতে হুজুরের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন–

والذى نفسى بيده لو أتاكم يوسف وأنا معكم فاتبعتموه وتركتمونى ضللتم

'আমার জীবন যার হাতে তাঁর শপথ! আমি বিদ্যমান থাকাবস্থায় তোমাদের নিকট যদি ইউসুফ (আ.) আগমন করেন আর তোমরা তাঁকে অনুসরণ করো এবং আমাকে পরিত্যাগ করো, তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

[মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৯৯৩০/ ১০১৬৫, বাইহাকী, ৪৮২৭]

চতুর্থ হাদীস

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন–

"لا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا ، وَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ وإما أَنْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ، وَإِنَّه -واللهِ-لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلا أَنْ يَتَّبِعَنِى"

তোমরা আহলে কিতাবের (ইহুদী, খ্রিস্টান) নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করো না, কেননা তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট; তোমাদেরকে তারা কখনও পথপ্রদর্শন করতে পারবে না। তাদের মত অনুযায়ী হয়তো তোমরা কোনো ভ্রান্ত বিষয়কে সঠিক মনে করবে, অথবা কোনো সঠিক বিষয়কে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করবে। আল্লাহর শপথ! তোমাদের মাঝে মুসা (আ.)ও যদি জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর জন্য আমাকে অনুসরণ ব্যতীত কোনো উপায় থাকত না। [মুসনাদে আহমাদ খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮৭]

আমরা জানি, হযরত দানিয়াল (আ.) একজন নবী ছিলেন। একজন নবীর কিতাব পাঠের কারণে হযরত উমর (রা.) যদি এক লোককে প্রহার করেন, তবে বেদ তার তুলনায় কোন স্তরের বিবেচিত হবে?

এ বিষয়ে সার কথা হলো, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যেকোনো কিতাব, চাই সে খ্রিস্টান, ইহুদী বা অন্য ধর্মের হোক কারও জন্য এ নির্দেশ দেওয়া জায়েয নেই যে, আপনারা নিজ নিজ ধর্মের কিতাবের অনুসরণ করুন।

সুতরাং এখানে যে উক্তিটি করে মাযহাবসমূহকে হিন্দু ধর্মের সাথে তুলনা করলেন, এ বিষয়টিকে আমরা কিভাবে ইসলামের দাওয়াত বলতে পারি?

অনেকেই হয়তো বলবেন,

বেদে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন কথা আছে, বেদে একত্ববাদের কথা আছে, মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া আছে ইত্যাদি। সে জন্যই তিনি বেদের দিকে ফেরার আহবান করেছেন। আমরা বলব, বিষয়টি যদি এমন হয়, তবে তা হিন্দুদের জন্য এটি একটি দুঃসংবাদ। কারণ মৌলিকভাবে তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার ধর্ম থেকে অন্য ধর্মের দিকে ফেরার আহ্বান করা হলো। অতএব, এখানে করতালি দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, বরং তাদের জন্য ক্রন্দন করা উচিত যে তাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম থেকে ফিরে আসার আহ্বান করা হচ্ছে। অথচ সকলেই এখানে করতালি দিয়ে বিষয়টি উপভোগ করেছেন!

এই করতালির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মক্কার মুশরিকদের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে–

'মক্কার মুশরিকদের এক সমাবেশে রাসূল (সা.) সূরা নজমের ১৯ ও ২০ নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন। আয়াত দু'টি হলো–

أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, লাত ও উয্যা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে?

(এ ঘটনাটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন,

كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا

'অর্থাৎ অধিকসংখ্যক সূত্রে ঘটনাটি বর্ণিত হওয়ায় এটি প্রমাণ করে যে এর একটি ভিত্তি আছে। (লুবাবুন নুকুল, পৃষ্ঠা-১৫০)

আমাদের এখানে ঘটনার সূত্র নিয়ে কোনো আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। মূল ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই সেটি আলোচনা করা উদ্দেশ্য। ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে- তাফসীরে তাবারী (খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৩৩), ইবনুল মুনযির, ইবনু আবি হাতেম (ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৬৩), আল্লামা তাবারানী, (আল-মুজামুল কাবিরা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৫৩]

এ আয়াত তেলাওয়াতের পর শয়তান রাসূলের (সা.)-এর ভাষায় বলল–

تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى

'অর্থাৎ এরা হলো সম্মানিত প্রতিমা, এদের সুপারিশের আশা করা যায়।

এ কথায় মক্কার মুশরিকরা যারপরনাই খুশি হলো। এ সূরার শেষে একটি সেজদার আয়াত আছে। আয়াতটি তেলাওয়াত করার সাথে সাথে উপস্থিত মুশরিকদের বড় বড় নেতারা সকলেই সিজদায় পড়ে গেল। তবে ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং আবু উহাইহা সাইদ ইবনে আস নামক দুই ব্যক্তি সিজদা করল না। তারা এক মুষ্টি মাটি নিয়ে কপালে লাগাল। এরা দুজন ছিল খুব বৃদ্ধ।

যাই হোক! এ ঘটনাই রয়েছে–

ففرح بذلك المشركون

মক্কার মুশরিকরা খুব খুশি হলো।

এই খুশির বিষয়টি এখানেও স্পষ্ট প্রতীয়মান। আমরা জানি, ডা. জাকির নায়েক হয়তো ভালো উদ্দেশ্য করে কথাটা বলেছেন! কিন্তু উপস্থিত শ্রোতারা ডা. জাকের নায়েকের সেই উদ্দেশ্য বুঝেই কি করতালি দিয়েছে? বিষয়টি প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়।

বেদের দিকে ফেরার বিষয়টি চোখ বুজে মেনে নেওয়া গেলেও মাযহাবকে হিন্দু ধর্মের সাথে তুলনীয় করে উল্লেখ করার বিষয়টি আমরা কিভাবে গ্রহণ করব? জাকির নায়েককে প্রশ্ন করা হয়েছে, ওহাবী, হানাফী... ইত্যাদি সম্পর্কে। তাকে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি। অথচ তিনি ইসলামের হক বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে সেগুলোকে হিন্দু ধর্মের সাথে তুলনা করেছেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টান ধর্মের সাথে তুলনা করেছেন, আর শায়েখের মুকাল্লিদ ডা. জাকির নায়েক মাযহাবসমূহকে হিন্দু ধর্মের সাথে তুলনা করলেন। আল্লাহ পাক আমাদের হিফাজত করুন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা. ইবরাহীম

বেলঘর, রাজাপুরা আরেফীয়া মাদরাসা, বলিয়া, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

জিজ্ঞাসা :

কোনো ব্যক্তি যদি ফজরের নামাযে সূরায়ে হাশর তেলাওয়াত করার পর ভুলবশত صدق الله العظيم পাঠ করে ফেলে তাহলে নামাযে কোনো প্রকার ত্রুটি হবে কি না?

সমাধান :

নামাযে صدق الله العظيم পড়া উচিত নয়। তবে কেহ পড়ে ফেললে নামায হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১০০, আল বাহরুর রায়িক ২/১৩)

প্রসঙ্গ : ওয়াকফ

মুহা. আব্দুল করিম

তালিমনগর, হোমনা, কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের গ্রামের এক হিন্দু ব্যক্তি তার একটি জমি মসজিদের নামে ওয়াকফ করে। পরবর্তীতে উক্ত জায়গার পার্শ্ববর্তী জমির মালিক সমাজের লোকদের সাথে সমঝোতা করে এই জমি নিজে দখল করে। এর বদলে অন্য একটি জমি মসজিদের নামে দিয়ে দেয়। আমার জানার বিষয় হলো, মসজিদের নামে উল্লিখিত হিন্দু ব্যক্তির জমি ওয়াকফ এবং এভাবে অন্য জমির মাধ্যমে উক্ত জমিটি পরিবর্তন করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সহীহ হয়েছে কি না? এবং পরিবর্তনীয় জমির সমুদয় আয় মসজিদের কাজে লাগানো বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

হিন্দু ব্যক্তি মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফ করা সহীহ হয়েছে। ওয়াকফকৃত জমি বিক্রি বা যেকোনোভাবে 'এওয়াজ' বদল করা বৈধ নয়। বিধায় হিন্দু ব্যক্তি কর্তৃক মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত জমিটি পরিবর্তন করা বৈধ হয়নি। যেকোনোভাবে জমিটি ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা মসজিদ কমিটি ও এলাকাবসীর ঈমানী দায়িত্ব এবং ওয়াকফকৃত জমিটি ফিরিয়ে আনার আগ পর্যন্ত উক্ত জমির আয় মসজিদের জন্য ব্যবহার করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। (রদ্দুল মুহতার, ৪/৩৪১)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মাও. রুহুল আমীন

খতীব, উত্তরা জামে মসজিদ, সেক্টর-১৪, উত্তরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তি জনৈকা এক মহিলার সাথে যেনা করে। অতঃপর উভয়ে নিজের সন্তান তথা একজনের ছেলে অপরজনের মেয়ের সাথে বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করে, জানার বিষয় হলো, যেনাকারীর ছেলের বিবাহ যেনাকারীনির মেয়ের সাথে বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

যেনাকারীর ছেলের বিবাহ যেনাকারীনির মেয়ের সাথে বৈধ হবে, যদি মেয়েটি যেনাকারীর বীর্য থেকে না হয়। (সূরা নিসা-২৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/২৭৭)

প্রসঙ্গ : কুরবানী

মাওলানা আব্দুর রজ্জাক

ইমাম, জামে মসজিদ সিরাজগঞ্জ, চরখুকশিয়া, ধুনট, বগুড়া।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় প্রচলিত নিয়ম হলো, বিবাহ অনুষ্ঠানে বর-কনে উভয় পক্ষের মেহমানদেরকে শর্ত করে দাওয়াত দেওয়া হয়, অর্থাৎ বরের পক্ষ থেকে যদি কনের বাড়িতে একশত লোক আসে, তাহলে কনের পক্ষ থেকেও একশত লোক বরের বাড়িতে যাবে। আর যদি দুইশত লোক আসে তাহলে দুইশত লোকই যাবে। এ রকম বিবাহ অনুষ্ঠানে কুরবানীর গোশত দ্বারা মেহমানদারী করানো যাবে কি না? এলাকার বেশ কয়েকজন মুফতী সাহেব পরামর্শ করে এ কথা বলেছেন যে, এমন অনুষ্ঠানে কুরবানীর গোশত ব্যবহার করা যাবে না। কারণ এ রকম অনুষ্ঠানে খাওয়ানোটা প্রতিদানস্বরূপ হয়ে থাকে আর কুরবানীর গোশত প্রতিদানস্বরূপ খাওয়ানো যায় না। উক্ত মুফতী সাহেবগণের কথাটি সঠিক কি না?

সমাধান :

বিবাহ শাদীতে এ ধরনের শর্ত করে খাওয়া-দাওয়ার প্রচলিত নিয়ম যদিও শরীয়তসম্মত নয়, তবে তা সম্পূর্ণভাবে প্রতিদান বা বিনিময়স্বরূপ বলা যায় না। বরং মেহমানদারীতে অবাঞ্ছনীয় শর্তের অনুপ্রবেশ বলা যায়, বিধায় এ ধরনের মেহমানদারীতে কুরবানীর গোশত পরিবেশন করা জায়েয হবে। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৮, বাদায়িউস সানায়ে, ৬/৩২৮)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মুহা. জাহাঙ্গীর আলম

ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার মেয়েকে আমার আপন মামাশ্বশুর বিয়ে করতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে ইসলামী আইনে কোনো বিধিবিধান আছে কি না?

সমাধান :

কোরআন-হাদীস তথা শরীয়তের বিধান

অনুযায়ী আপন বোনের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম, অতএব আপনার মেয়েকে আপনার আপন মামাশ্বশুরের সাথে বিবাহ দেওয়া বৈধ হবে না। (সূরা নিসা-২৩, রদ্দুল মুহতার ৩/২৮)

প্রসঙ্গ : কসম

মাও. ইবরাহীম খলীল
শিক্ষাসচিব, মদীনাতুল উলূম মাদরাসা, দৌলতখান, ভোলা।

জিজ্ঞাসা :

আমি একদিন তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ব্যাপারে বললাম যে আমি যদি আজ থেকে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায না পড়তে পারি, তাহলে আমি অবশ্যই একশত রাকআত নফল নামায আদায় করব ইনশাআল্লাহ। এখন যদি শেষ রাতে ঘুম না ভাঙার কারণে তাহাজ্জুদ পড়তে না পারি, তাহলে আমার একশত রাকআত নফল নামায আদায় করা লাগবে কি না? যদি আদায় করা লাগে তাহলে 'নাওয়াফেল' তথা ইশরাক, চাশত, ইত্যাদি তার অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? যদি এশার নামাযের পর রাত ১০/১১টার সময় তাহাজ্জুদ পড়ি, তাহলে আমার শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়ত পূরণ হবে, নাকি শেষ রাতেই পড়া লাগবে?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে কসমের বাক্যের সাথে ইনশাআল্লাহ বলা হলে উক্ত কসম সংঘটিত হয় না বিধায় শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে না পারলে আপনার ওপর কাফফারা আসবে না। (জামিউত তিরমিযী ১/২৮০, ফাতহুল কৃদীর ৪/৩৭৬)

প্রসঙ্গ : ভিডিও

মাও. হোসাইন
পটুয়াখালী।

জিজ্ঞাসা :

কোনো নবী বা সাহাবীর জীবন ইতিহাস ফিল্ম আকারে বের করার শরয়ী বিধান কী? এবং যদি আরবী ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তার হুকুম কী?

সমাধান :

প্রাণবিহীন বস্তু ব্যতীত সমস্ত প্রাণীর সর্বপ্রকার ফিল্ম ও ভিডিও (গান-বাজনা সংযুক্ত হোক বা গান-বাজনা মুক্ত হোক) বের করা, বা দেখা উভয়টা নাজায়েয ও হারাম। চাই সেটা আরবী শিক্ষার উদ্দেশ্যে বা অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে হোক। উপরন্তু কোনো নবী বা সাহাবীর জীবন ইতিহাস ফিল্ম ও ভিডিও আকারে বের করা বা দেখা, মূলত নবী ও সাহাবাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার নামান্তর। বিধায় তা মারাত্মক বড় গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি। (মুসলিম শরীফ ২/২০১, রদ্দুল মুহতার ১/৬৪৭)

প্রসঙ্গ : সুদ/ব্যবসা

মুহা. আব্দুল্লাহ আল মামুন
রাজবাড়ী।

জিজ্ঞাসা :

আমি কাউকে বিশ হাজার টাকা দিলাম, বললাম, এক বছর পর আমাকে চল্লিশ হাজার টাকা দিতে হবে, অতঃপর উক্ত ব্যক্তি টাকার পরিবর্তে চল্লিশ মণ ধান দিল। প্রতি মণ এক হাজার টাকা। আর যদি বলি এক বছর পর আমাকে চল্লিশ মণ ধান দিতে হবে অতঃপর উক্ত ব্যক্তি চল্লিশ মণ ধান বাজার থেকে ক্রয় করে এনে দিল, তাহলে তার হুকুম কী? এটা সুদ হবে কি না?

সমাধান :

কর্জ দিয়ে শর্ত করে অতিরিক্ত কোনো কিছু দেওয়া-নেওয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা সম্পূর্ণ হারাম। তাই বিশ হাজার টাকা কর্জ দিয়ে এক বছর পর অতিরিক্ত আরো বিশ হাজার টাকা নেওয়া বা অতিরিক্ত বিশ হাজার টাকার পরিবর্তে ধান নেওয়া হারাম। আর আপনি যদি চুক্তির শুরুতে বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে চল্লিশ মণ নির্দিষ্ট প্রকারের ধান খরিদ করার চুক্তি করে থাকেন এবং সে পরবর্তীতে বাজার থেকে ধান কিনে দেয় তাহলে তা জায়েয হবে। (ফাতাওয়া শামী ৫/১৬৬)

প্রসঙ্গ : দাওয়াত ও হাদিয়া

ইঞ্জি. মুহা. মঈনুল হোসাইন
উত্তরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার বড় ছেলে একটি অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের (আইপিডিসি) একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন শিল্পোন্নয়নে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান করে থাকে। আমার ছেলে সপরিবারে আলাদাভাবে বসবাস করে। উল্লেখ্য, তার চাকরির এই উপার্জন ব্যতীত অন্য কোনো উপার্জন নেই, আর আমরাও আর্থিকভাবে সচ্ছল (সাহেবে নেসাব) এমতাবস্থায় তার পক্ষ হতে মেহমানদারী, আর্থিক সুবিধা গ্রহণকরণ ইত্যাদি বিষয়ে শরয়ী বিধান জানতে ইচ্ছুক।

সমাধান :

এ ধরনের সুদি অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের চাকরি ও বেতন বৈধ নয়, যেহেতু আপনার ছেলের কাছে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বেতন ছাড়া অন্য কোনো আয়ের উৎস নেই বিধায় আপনার ছেলের পক্ষ থেকে দাওয়াত ও তার কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। ছেলের মন রক্ষার্থে অপারগতায় কোনো কিছু নিতে বাধ্য হলে তা গরিবদেরকে সদকা করে দিতে হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৩)

প্রসঙ্গ : সাহু সিজদা

মুহা. ফিরোজ কামাল
বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি হানাফী মাযহাবের সাহু সিজদা আদায় পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই। দলিলসহ জানালে উপকৃত হব?

সমাধান :

নামাযের মধ্যে ভুলবশত কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে বা নামাযের ফরজ ও ওয়াজিবসমূহের পরস্পর ধারাবাহিকতায় আগে-পরে হলে বা

ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ ডবল আদায় করলে অথবা ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায়ে বিলম্ব হলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়। যার আদায়ের পদ্ধতি হলো, শেষ বৈঠকে তাশাহুদ তথা-আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর ডান দিকে এক সালাম ফিরাবে, অতঃপর নামাযের ন্যায় দুটি সিজদা দেবে এবং পুনরায় তাশাহুদ, দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাছুরা পড়ে নামায শেষ করবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/১০১)

প্রসঙ্গ : তামাক

মুহা. আলী মর্তুজা
মিরপুর-১২, ব্লক-ই, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমানে তামাককে শোধনের মাধ্যমে বিড়ি, জর্দা ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে–এগুলো সেবন করার বিধান কী?

সমাধান :

তামাক-জাতীয় বস্তু শরীরের জন্য ক্ষতিকর বিধায় তা সেবন না করাই শ্রেয়। (মুসলিম শরীফ ১/২০৯)

প্রসঙ্গ : মসজিদের দান

মুহা. আবু জর
ইমাম, কাঞ্চনেশ্বর জামে মসজিদ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদে জুমু'আর নামাযান্তে মুসল্লিরা মসজিদে কিছু টাকা দান করে থাকেন। যা মসজিদের ক্যাশিয়ারের নিকট জমা থাকে এবং এর দ্বারা মসজিদের আসবাব তথা মসজিদে সুগন্ধির জন্য আগরবাতি, লাইট ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। কিন্তু কিছু লোক বলছে উল্লিখিত টাকার দ্বারা আগরবাতি ক্রয় করা ঠিক নয়। কেননা এর দ্বারা কোনো ফায়দা নেই। অনর্থক টাকা ব্যয় করা। জানার বিষয় হলো, উক্ত টাকার দ্বারা আগরবাতি ক্রয় করে মসজিদে সুগন্ধির জন্য জ্বালানো শরীয়তসম্মত কি না?

সমাধান :

মুসল্লিদের দানের টাকা মসজিদের প্রয়োজনে ও স্বার্থে খরচ করার অনুমতি আছে। তাই মসজিদকে সুগন্ধিময় রাখার লক্ষ্যে খোশবুদার আগরবাতি ইত্যাদি জ্বালানো বাবদ উক্ত টাকা ব্যয় করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে জায়েয হবে। তবে দাতাগণ সরাসরি বারণ করলে ব্যয় করা যাবে না। (ফাতহুল ক্বদীর ৬/২২৩)

প্রসঙ্গ : মাদরাসা

মাও. রফিকুল ইসলাম
হুসাইনিয়া মাদরাসা, বড়চালা, ভালুকা, মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের কওমী মাদরাসাগুলোতে যে বোডিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়, সেখানে গরিব-ধনীদের ছেলেরা লেখাপড়া করে। ধনীদের ছেলেরা টাকা দিয়ে খানা খায় এবং গরিব ছেলেদের জন্য মাদরাসার যাকাত ফান্ড থেকে তাদের খোরাকি বহন করা হয় এবং তাদের খানা একই সাথে পাকানো হয়। আমার জানার বিষয় হলো, উভয় প্রকার ছাত্রের খানা একসাথে পাকানো জায়েয আছে কি না?

সমাধান :

আমাদের কওমী মাদরাসাগুলোতে একই সাথে ধনী-গরিব ছাত্রদের খানা পাকানোর যে পদ্ধতিটা প্রচলিত তা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ এবং এ ব্যবস্থার মধ্যে শরয়ী দৃষ্টিকোণে আপত্তির কিছু নেই। (সূরা বাকারা-২২০)

প্রসঙ্গ : অলংকার/অসিয়ত

মুহা. আবু সাঈদ ইবনে তাহের
দিনাজপুর।

জিজ্ঞাসা-১

বর্তমানে মুসলমান মহিলারা নাকে নত ও কানে দুল ব্যবহার করে। এটা জায়েয আছে কি না?

সমাধান-১

মহিলাদের জন্য নাকে ও কানে অলংকার ব্যবহার করা জায়েয। (সহীহ বুখারী ২/৮৭৪)

জিজ্ঞাসা-২

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যাওয়া জরুরি কি না?

সমাধান-২

কোনো ব্যক্তির জিম্মায় আল্লাহর হক তথা নামায, রোজা, হজ ইত্যাদি ফরয হওয়া সত্ত্বেও আদায় না করার কারণে বাকি থাকলে এবং বান্দার হক তথা-কারো কর্জ বা আমানত থাকলে তা আদায় করে দেওয়ার জন্য অসিয়ত করে যাওয়া জরুরি। অন্যথায় অসিয়ত করে যাওয়া জরুরি নয় বরং ওয়ারিশদের ক্ষতিসাধন না হয়–এমন অসিয়ত করে যাওয়া মুস্তাহাব। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৩১৭)

প্রসঙ্গ : জানাযা/মায়্যিত

মাও. ইসলামুদ্দীন
হুসেনপুর মাদরাসা, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা-১

এক মাওলানা সাহেব জানাযাকে সামনে রেখে বলেন যে, কোনো মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে যদি ৪০ জন মু'মিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে লোকটি ভালো ছিল, তাহলে সে ভালো। এ কথাটি রাসূল (সা.)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাঁর এ কথাটি কতটুকু সঠিক?

সমাধান-১

হাদীসে আছে যদি ৪০ জন মু'মিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় লোকটি ভালো ছিল, তাহলে সে ভালো–এ কথাটি সঠিক। কিন্তু উক্ত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তি মারা গেলে সমস্ত নেক লোকেরা তার বিরহের বেদনায় অন্তর থেকে প্রশংসা ও দু'আ করে থাকে এবং তাকে ভালো বলে সাক্ষ্য দেয়। আর নেক লোকদের ভালো বলার ফলে তার যদি কোনো গোনাহও থাকে আল্লাহ সেগুলো ক্ষমা করে দেবেন। তবে এ ক্ষেত্রে সাক্ষীর আবেদন করার কথা হাদীসে নেই বরং স্বেচ্ছায় মন থেকে সাক্ষী দেওয়াই হাদীসের উদ্দেশ্য। (মিশকাত শরীফ-১৪৫)

জিজ্ঞাসা-২

জানাযাকে সামনে রেখে জনতাকে সম্বোধন করে এরূপ বলা যে, লোকটি

কেমন ছিল? এর উত্তরে উপস্থিত জনতা বলে থাকে–ভালো, ভালো। এটা শরীয়তসম্মত কি না?

সমাধান-২

যদি তাদের এ বিশ্বাস থাকে যে সবাই লোকটাকে ভালো বললে সে ভালো হয়ে জান্নাতী হয়ে যাবে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সে খারাপ হোক না কেন। তাহলে জানাযা সামনে নিয়ে এরূপ বলা সঠিক হবে না। কারণ এ ধারণা ভ্রান্ত। বর্তমানে আমাদের দেশে এটা একটা প্রথা হিসেবে চালু হয়ে গেছে এবং তাদের ধারণাও হয়ে গেছে যে সবাই ভালো বললে সে লোকটি আল্লাহর দরবারে ভালো হয়ে যাবে এবং জান্নাতী হবে। তাদের এর ধারণার শরীয়তে কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং এরূপ প্রথা বানিয়ে নেওয়া শরীয়তসম্মত না হওয়ায় তা পরিত্যাজ্য। (ফাতহুল বারী ২/৩২১)

প্রসঙ্গ : কুরবানী

মুহা. রিদওয়ানুল হক
শ্রীবরদী, শেরপুর।

জিজ্ঞাসা-১

আব্দুল্লাহ তার ওয়াজিব কুরবানী আদায়ের নিয়তে পশু ক্রয় করে মাদরাসায় দান করে দেয় এবং তার পক্ষ থেকে কুরবানী করতে বলে। পরবর্তীতে কুরবানীর দিনে তার পক্ষ থেকে তা জবাই করা হয়। জানার বিষয় হলো, কুরবানীর পূর্বেই পশুটি মাদরাসায় দান করে দেয়ায় তার পক্ষ থেকে ওয়াজিব আদায় হবে কি না?

সমাধান-১

কুরবানীদাতা নিজের কুরবানী আদায়ের জন্য মাদরাসায় যে পশু দিয়ে থাকে তা মূলত তাওকীলের পর্যায়ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তার পক্ষ থেকে কুরবানী আদায়ের উকিল বা দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে উকিলের মাধ্যমে কুরবানী আদায় করা জায়েয। তাই দাতার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। (আদ্দুররুল মুখতার ২/১০২)

জিজ্ঞাসা-২

উক্ত পশুর লালন-পালন ও জবাই ইত্যাদির খরচ কে বহন করবে? মাদরাসা কর্তৃপক্ষ নাকি দাতা? মাদরাসার পক্ষ থেকে খরচ দেয়া হলে দাতার কুরবানী আদায় হবে কি না?

সমাধান-২

এ ধরনের পশু দিয়ে যেহেতু দাতার কুরবানী আদায় করা হয়, তাই এর যাবতীয় খরচ তাকেই বহন করতে হবে। মাদরাসার ফান্ড থেকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের কুরবানী আদায় বাবদ ব্যয় করা যাবে না। গোশতগুলো মাদরাসায় দেয়ার কারণে যদি মাদরাসার ফান্ড থেকে পশুর লালন-পালন বা জবাই খরচ বহন করে, তবে তা গোশতের বিনিময় হিসেবে গণ্য হয়ে কুরবানী মাকরূহ হবে। (এমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৫৪৮, আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৩৪)

প্রসঙ্গ : চাকরি

মুহা. আব্দুল্লাহ
শিবচর, মাদারীপুর।

জিজ্ঞাসা : ক-খ

সুদি ব্যাংকে চাকরি করে বেতন নেওয়া বৈধ হবে কি না? বর্তমানে সকল সরকারি ব্যাংকগুলোতেই কি সুদি লেনদেন হয়?

সমাধান : ক-খ

সরাসরি সুদি কর্মকাণ্ডে জড়িত সবাই অভিশপ্ত। তাই সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত সুদি ব্যাংকে চাকরি করে বেতন নেওয়া অবৈধ। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৩)

জিজ্ঞাসা-গ

কারেন্ট অ্যাকাউন্ট (যেখানে সুদ তো দেয় না বরং রাখার কারণে টাকা কাটে) করার দ্বারা আমার গোনাহ হবে কি? কারণ আমার টাকা নিয়ে তো অন্যত্রে সুদ দিচ্ছে এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

সমাধান-গ

নিজের অর্থ-সম্পদ সংরক্ষণ করার জন্য অতি প্রয়োজনে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখার অবকাশ আছে। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৪৬)

প্রসঙ্গ : টেস্টটিউব বেবি

মুহা. এহসানুল ইসলাম, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

এক দম্পতি, যাদের ১৬ বছর আগে বিবাহ হয়, কিন্তু তাদের এখন পর্যন্ত কোনো সন্তান হয়নি। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন সময়ে দেশে ও বিদেশে চিকিৎসা করার পর চিকিৎসকগণ সিদ্ধান্ত দেন যে, স্ত্রীর জরায়ুর রাস্তা জন্মগতভাবে স্বাভাবিক না হওয়ার কারণে স্বামীর শুক্রাণু স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশপথে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যার কারণে স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীর গর্ভধারণ সম্ভব নয়, বিধায় সকল চিকিৎসকগণ প্রথমে IUI অন্যথায় IVF করার পরামর্শ দেন। এমতাবস্থায় IUI এবং IVF পদ্ধতিটি সম্বন্ধে শরীয়তের হুকুম কী? উল্লেখ্য যে, স্বামীর বীর্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি-১. স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে। ২. স্ত্রীর সংস্পর্শে স্ত্রীর হস্তের মাধ্যমে। ৩. নিজ হস্তের মাধ্যমে।

সমাধান :

সন্তান জন্ম দেওয়া এমন কোনো শরয়ী জরুরত নয়, যার ফলে পর নারী-পুরুষ ডাক্তারের সামনে বেপর্দা হওয়া বা লজ্জা স্থান খোলার মতো হারাম কাজ বৈধ হতে পারে। শুধুমাত্র মনের স্বাদ ও আবেগ মেটাতে বহু গর্হিত কর্মের সমষ্টি 'টেস্টটিউব বেবি'র পদ্ধতি গ্রহণের অনুমতি দেওয়া যায় না। হ্যাঁ, যদি কোনো দম্পতি স্বাভাবিকভাবে সন্তান জন্ম দিতে অপারগ হয়, তাহলে প্রশ্নে বর্ণিত IUI বা IVF পদ্ধতি অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে শিখে পর্দার আড়ালে তার দেওয়া দিকনির্দেশনা মতে নিজেরাই যদি সম্পাদন করতে পারে, তাহলে তা বৈধ হতে পারে, অন্যথায় নয়। উল্লেখ্য, প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্বামীর বীর্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বর্ণিত প্রথম পদ্ধতিটি অবলম্বন করা বৈধ, দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা অনুচিত, আর তৃতীয় পদ্ধতিটি অবলম্বন করা বৈধ নয়। (আহসানুল ফাতাওয়া ৮/২১৪)

প্রসঙ্গ : কবরস্থান/মাদরাসা

মুহা. ওসমান গণি
রামপুরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার আব্বা মারা যাবার পূর্বে পারিবারিক কবরের জন্য ১ কাঠা জায়গা ক্রয় করেন এবং ওই জায়গায় তাঁকে দাফন করা হয় (১৯৮৬ সালে)। জায়গাটি আমাদের এলাকার তারা মসজিদসংলগ্ন। পরবর্তীতে মসজিদ এবং কবরস্থানসংলগ্ন মাদরাসার জন্য জায়গা ওয়াকফ করা হয়। আমার অন্য দুই ভাই কবরের এক কাঠা জায়গা থেকে তাদের অংশের জায়গা মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করে। তাদের এই দান বা ওয়াকফ শরীয়ত মোতাবেক কি না? বর্তমানে স্থানীয় লোকজন এবং মসজিদ ও মাদরাসার কমিটির লোকজন আমার অংশের জায়গার ওপরে যেখানে আব্বার কবর রয়েছে, এর ওপর মাদরাসার ছাদ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং কবরের নিচে বেজ ঢালাই করতে চায়?

সমাধান :

আপনার দুই ভাই কবরের এক কাঠা জায়গা থেকে তাদের অংশ মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করা শরীয়ত মোতাবেক সহীহ হয়েছে, আর আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনার অংশ যেখানে আপনার আব্বার কবর রয়েছে, উক্ত কবরের নিশানা নিশ্চিহ্ন করে তার ওপরে মাদরাসার ছাদ ও নিচে বেজ ঢালাই করতে শরয়ীভাবে কোনো সমস্যা নেই। এতে আপনার আব্বার কবরের কোনো অসম্মানও হবে না, আর যদি আপনি অনুমতি না দেন তাহলে মসজিদ-মাদরাসার কমিটির জন্য জোরপূর্বক এ ধরনের কাজ করা জায়েয হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/২৩৩, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/১৪০)

প্রসঙ্গ : নামায, মাযহাব

মাও. শহীদুল ইসলাম
বাহরাইন।

জিজ্ঞাসা-১

আমি একজন হানাফী মাযহাবের অনুসারী বাহরাইন একটি মসজিদে ইমামতি করি, ওখানকার নিয়ম হলো, রামাজান মাসে তারাবীহ পড়ানোর সময় একটি বড় কোরআন শরীফ ইমাম সাহেবের সামনে রাখে, আর ইমাম সাহেব তা দেখে দেখে তেলাওয়াত করে, আর কোরআন শরীফ বড় হওয়াতে নামাযের মধ্যে কোনো পৃষ্ঠা উল্টাতে হয় না, আমাকে রামাজানে তারাবীহ পড়াতে হবে আমি গায়রে হাফেজ এখন আমার জন্য দেখে দেখে কোরআন শরীফ পড়ে নামায পড়ানো সহীহ হবে কি না?

সমাধান-১

হানাফী মাযহাব মতে, নামাযে পবিত্র কোরআন দেখে দেখে পড়লে নামায ভেঙে যাবে। যদিও কোরআন শরীফ বড় হওয়ার দরুন পৃষ্ঠা উল্টানোর প্রয়োজন না পড়ে। বিধায় আপনার জন্য কোরআন শরীফ দেখে দেখে তারাবীর নামায পড়ানো বৈধ হবে না। (রদ্দুল মুহতার ১/৬২৪)

জিজ্ঞাসা-২

এখানে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলে তা আদায় করার নিয়ম হলো, তাশাহুদ, দরূদ শরীফ, দু'আয়ে মাছুরার পর কোনো দিকে সালাম ফিরানো ছাড়া দুই সিজদা করে সাথে সাথে সালাম ফিরিয়ে দেয়। দ্বিতীয়বার তাশাহুদ ইত্যাদি পড়া হয় না। এভাবে সিজদায়ে সাহু করলে তা আদায় হবে কি না? আর আমি হানাফী মাযহাবের অনুসারী, তা করার অবকাশ আছে কি না?

সমাধান-২

প্রশ্নে বর্ণিত সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতিটি শাফেয়ী মাযহাব মতে শুদ্ধ হলেও হানাফী মাযহাবানুসারে শুদ্ধ নয়। বিধায় আপনার জন্য তা অনুসরণ করা বৈধ হবে না। (জামিউত তিরমিযী ১/৯০)

জিজ্ঞাসা-৩

এখানে কোনো মুসল্লির জরুরি কাজ থাকলে আমি যখন ফরজের পূর্বে সুন্নাত পড়ি তখন তারা আমার পেছনে ফরজের ইক্তিদা করে ফেলে এখন তাদের নামায আদায় হবে কি না?

সমাধান-৩

নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরজ নামায আদায়কারীর ইক্তিদা হানাফী মাযহাব মতে শুদ্ধ নয়। তবে আপনার মুক্তাদীরা যদি হানাফী মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাবের অনুসারী হয়ে থাকে তাহলে তাদের নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। (আল হিদায়া ১/১০৭)

জিজ্ঞাসা-৪

উপরোক্ত বিষয়গুলো হানাফী মাযহাব অনুসারে যদি সহীহ না হয়ে অন্য কোনো মাযহাবে সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে আমার চাকরি রক্ষার্থে ওই মাস'আলাগুলোর ক্ষেত্রে ওই মাযহাবের ওপর আমল করা জায়েয হবে কি না?

সমাধান-৪

উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ মুসলমানদের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহের ওপর সঠিকভাবে আমল করার লক্ষ্যে চার মাযহাবের কোনো এক নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব তথা-অত্যাবশ্যকীয়। কিছু বিষয়ে এক মাযহাবের অনুসরণ এবং অন্য কিছু বিষয়ে অন্য মাযহাবের অনুসরণ করাকে 'তালফিক' বলা হয়। একান্ত অপারগতার ক্ষেত্রে অন্য মাযহাবের ওপর আমল করার অবকাশ থাকলেও চাকরি রক্ষা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে তেমন বিশেষ প্রয়োজন হিসেবে পরিগণিত নয়। বিধায় আপনার জন্য চাকরি রক্ষার পার্থিব স্বার্থে ওই মাস'আলাসমূহের ক্ষেত্রে অন্য মাযহাবের ওপর আমল করা বৈধ হবে না। (আদ্দুররুল মুখতার ১/১৫, রদ্দুল মুহতার ১/৭৫)

মলফূজাতে আকাবের

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

সুন্নাতের অনুসরণ

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুল হক (রহ.) বলেন, মানুষের জন্য অভ্যাস ও স্বভাবের বিপরীত কাজ করা কঠিন। যেমন–কোনো ছোট বাচ্চা বা পাগলও ভুলে খাবার নাকে বা কানে দেয় না। বরং মুখেই দেয়। তেমনিভাবে হক্কানী পীরের তা'লীম এবং সান্নিধ্যে মুরীদের ইবাদত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ভুলেও সুন্নাত পরিপন্থী কাজ করতে পারে না। হযরত মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজের মক্কী (রহ.) মক্কা মুকাররামায় থাকাকালীন নিজের প্রিয় মুরীদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.)-এর নিকট তাঁর অবস্থা জানতে চাইলে তিনি লিখেন, হযরত! আমার অবস্থাই বা কী? হযরতকে অবগত করার উপযোগী নয়। তবে হযরতের জুতার বরকতে অধমের মধ্যে তিনটি জিনিস পাচ্ছি।

(১) شریعت طبیعت بن گئی (২) قرآن واحادیث کے اندر کہیں تعارض نظر نہیں آتا (৩) مدح اور ذم ایک برابر معلوم ہوتا ہے

অর্থাৎ : ১. শরীয়তের অনুসরণ আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। ২. কোরআন-হাদীসে কোথাও তা'আরুজ তথা পরস্পর বিরোধিতা নজরে পড়ছে না ও ৩. আমার ব্যাপারে প্রশংসা এবং নিন্দা সমান মনে হয়। (তাযকারায়ে আযীয ১৯৬)

অতিরিক্ত আহারের ক্ষতি

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, যে অতিরিক্ত আহার করে তার খানা ভালোভাবে হজম হয় না। দৈনন্দিন বদহজমীর অভিযোগ থাকে। তাতে বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হতে হয়। ফলে ওষুধের মধ্যে প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে পরিমিত আহার করে তার খানা ভালোভাবে হজম হয়। তার স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। (ইসলামী তাহযীব)

কুদৃষ্টির প্রতিকার

জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)-এর নিকট কুদৃষ্টির প্রতিকার জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বললেন, হিম্মত (সাহসিকতা) ও অধিক সহ্য করা ব্যতীত তার অন্য কোনো প্রতিকার নেই। তবে দুটো জিনিস তার সহায়ক হতে পারে। ১। আযাবের কথা সব সময় স্মরণ রাখা। ২। বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার যিকির করা। (কামালাতে আশরাফিয়্যা)

আত্মশুদ্ধির সুপথ্য

হযরত মাওলানা কারী আমীর হুসাইন (রহ.) বলেন, পর্যাপ্ত পরিমাণ খাও এবং ঘুমাও। শুধুমাত্র দুটিই পথ্য– ১। কথা কম বলো ২। মানুষের সাথে মেলামেশা কম করো। প্রথম যুগে কম খাওয়া ও কম ঘুমানো ও সুপথ্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে দুটোর মধ্যে শিথিল করা হয়েছে। তবে বাকি দুটোর মধ্যে কঠোর করা হয়েছে। (কালিমাতে সিদক ও আদল)

আখিরাতের জন্য বেশি কাজ করো

হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী তায়্যিব (রহ.) বলেন, যেহেতু দুনিয়াতে অল্প কিছুদিন থাকতে হয়, তাই তার জন্য কাজও অল্প করো, আখিরাতে যেহেতু অফুরন্ত হায়াত থাকতে হবে, তাই তার জন্য কাজও বেশি করো।

নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, দুনিয়ার জন্য এতটুকু কাজ করো, যে পরিমাণ দুনিয়াতে থাকতে হয় এবং আখিরাতের জন্য এতটুকু কাজ করো যে, পরিমাণ আখিরাতে থাকতে হবে। (ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম)

দ্বীন ধর্ম সংরক্ষণের একমাত্র মাধ্যম

মুফতী আজম হযরত মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে বলছি যে, কোনো মুসলমান যদি তিনটি কাজ করতে থাকে তাহলে তার অন্তর অবশ্যই বাতেনী নূরের দ্বারা নূরানী হবে এবং পরিপূর্ণ ঈমানী জযবা তার মাঝে জাগ্রত হবে। সর্বপ্রকার পথভ্রষ্টতা থেকে রেহাই পাবে।

১। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করাকে বাধ্যতামূলক করে নেওয়া।

২। সব কাজে এবং প্রত্যেক প্রকারের আমলে সুন্নাতের অনুসরণ করা, বিদআত থেকে বেঁচে থাকা।

৩। সলফে সালেহীনের অনুসরণ করা। (মাকালাতে মুফতীয়ে আজম রহ.)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
“আল-আবরার” এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ

চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩